ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

সমাজ বিজ্ঞান

দশম শ্রেণির ভূগোল পাঠ্যবই

সমকালীন ভারত - ২

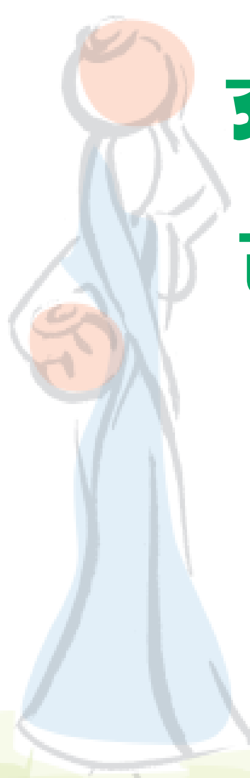

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার

এন সি ই আর টি অনুমোদিত
প্রথম বাংলা সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০২০

প্রচ্ছদ : অরূপ চৌধুরী

প্রকাশক : রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ ত্রিপুরা

মূল্য : ৭৫ টাকা

মুদ্রণ : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

©এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সমকালীন ভারত - ২

দশম শ্রেণির ভূগোল

(এন সি ই আর টি-র ~ ***Contemporary India Part -II*** *পাঠ্য পুস্তকের ২০১৮ সালের অনূদিত সংস্করণ)*

অক্ষর বিন্যাস
অরূপ চৌধুরী

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

উপদেষ্টা

ড. অর্ণব সেন, সহ অধ্যাপক,
এন ই আর আই ই, শিলং (এন সি ই আর টি)
ড. অরূপ কুমার সাহা, সহ অধ্যাপক,
আর আই ই, ভূবনেশ্বর (এন সি ই আর টি)

অনুবাদক

আশিস দেবনাথ
ভাস্বতী সেনগুপ্ত দেবনাথ
শর্মিলা দেব্বর্মা
পার্থ রায়
সুদীপ্তা পাল

ভাষা পরিমার্জনায়

বিশ্বনাথ রায়
এমেলী নাগ
শুক্লা সিনহা

Foreword

The National Curriculum Framework (NCF), 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centred system of education outlined in the National Policy on Education (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that, given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily time-table is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days are actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) appreciates the hard work done by the textbook development committee responsible for this book. We wish to thank the Chairperson of the advisory committee for textbooks in Social Sciences, at the higher secondary level, Professor Hari Vasudevan and the Chief Advisor for this book, Professor M.H. Qureshi for

guiding the work of this committee. Several teachers contributed to the development of this textbook; we are grateful to their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations which have generously permitted us to draw upon their resources, material and personnel. We are especially grateful to the members of the National Monitoring Committee, appointed by the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development under the Chairpersonship of Professor Mrinal Miri and Professor G.P. Deshpande, for their valuable time and contribution. As an organisation committed to systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

Director
National Council of Educational Research and Training

New Delhi
20 November 2006

Textbook development committee

Chairperson, Advisory Committee for Textbooks in Social Sciences at the Secondary Level

Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, University of Calcutta, Kolkata

Chief Advisor

M. H. Qureshi, *Professor,* Centre for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Advisor

B. S. Butola, *Professor,* Centre for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Members

Aparajita De, *Lecturer*, Department of Geography, Delhi School of Economics, University of Delhi, Delhi

Geeta Duggal, *Former Principal*, Delhi Public School, Rewari

Indu Sharma, *PGT,* Demonstration School RIE, Ajmer

K. Jaya, *PGT*, Convent of Jesus and Mary, Bangla Sahib Road, New Delhi

Punam Behari, *Reader,* Miranda House, University of Delhi, Delhi

Saroj Sharma, *TGT (Retd.)*, Mother's International School, Sri Aurobindo Marg, New Delhi

Member-coordinator

Aparna Pandey, *Lecturer*, Department of Education in Social Sciences and Humanities, NCERT, New Delhi

Acknowledgements

The National Council of Educational Research and Training acknowledges the support of individuals and organisations as listed below for providing various photographs and other materials such as articles used in this textbook — Shveta Uppal, NCERT, New Delhi for Fig. 1.11, 2.4, 4.3, 4.10, 4.11, 7.3, 7.4, 7.5; Kalyan Banerjee, NCERT, New Delhi for Fig. 7.9; Centre for Science and Environment, New Delhi for Fig. 2.2 (Endangered : the Nicobar megapode), 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 5.14; CCSHAU, Hisar for Fig. 4.4(a), 4.13, 4.16; Directorate of Extension, Ministry of Agriculture, I.A.R.I. Campus, New Pusa, New Delhi for Fig. 4.2, 4.4(b), 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (Groundnut and Mustard), 4.12 (Apple and Pomegranate), 4.15, 4.18; Ministry of Environment and Forests, Govt. of India for Fig. 2.2, 2.3, 4.17, 5.10, 6.11; Ministry of Coal, Govt. of India for Fig. 5.11(a) and (b); Ministry of Mines, Govt. of India for Fig. 5.3, 5.5, 5.8; Department of Road Transport and Highways, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Govt. of India for Fig. 7.2, 7.10; Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Govt. of India for Fig. 5.12, 6.6, 6.9, 6.10, 6.12; Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Govt. of India for Fig. 7.6, 7.7, 7.8; Kurukshetra magazine for collage on page 24; The Times of India for collage on page 20, 24, 29, 26, 57, 91; *The Hindu* for collage on page 20; Hindustan for collage on page 91; NCERT, *Social Science*, Part-II, Textbook for Class-VIII for Fig. 1.12, 2.1, 3.2.

The Council is thankful to the Survey of India for certification of maps given in the textbook.

Acknowledgements are due to Savita Sinha, *Professor* and *Head*, Department of Education in Social Sciences and Humanities for her valuable support at every stage of preparation of this textbook.

Special thanks are due to Vandana R. Singh, *Consultant Editor* for going through the textbook and for giving useful suggestions.

The Council also gratefully acknowledges the contributions of Ishwar Singh, *DTP Operator;* Ajay Singh, *Copy Editor;* Dinesh Kumar, *Computer Incharge*, who have helped in giving a final shape to this book. The contribution of the Publication Department, NCERT are also duly acknowledged.

The following are applicable to all the maps of India used in this textbook

1. © Government of India, Copyright 2006
2. The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher.
3. The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line.

4. The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh.
5. The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted from the "North-Eastern Areas (Reorganisation) Act.1971," but have yet to be verified.
6. The external boundaries and coastlines of India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India.
7. The state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chhattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned.
8. The spellings of names in these maps have been taken from various sources.

School Bhuvan–NCERT an Online web portal

Web based online e-learning Geo spatial portal **School Bhuvan–NCERT** (URL: http://bhuvan.nrsc.gov.in/governance/mhrd_ncert/) has been launched by NCERT and ISRO in collaboration to enhance geo spatial skills among students. This online e-learning portal includes thematic maps given in Geography textbooks. This portal enables students to use Geo-spatial technology for better understanding of concepts in Geography. Online activities available on the portal as Level 1, Level 2 and Level 3 encourage learners from Classes VI to XII to develop neighbourhood maps and their attributes on satellite imageries available on **School Bhuvan–NCERT**.

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

* (k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

**(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010). Constitution of India.*

সূচিপত্র

1.	সম্পদ এবং উন্নয়ন	১
2.	বন ও বন্যপ্রাণী সম্পদ	১৪
3.	জল সম্পদ	২৩
4.	কৃষি	৩৪
5.	খনিজ এবং শক্তি সম্পদসমূহ	৫০
6.	শ্রমশিল্প	৬৫
7.	জাতীয় অর্থনীতির জীবনরেখাসমূহ	৮১
	পরিশিষ্ট -I	৯৪
	পরিশিষ্ট -II	৯৫
	পরিশিষ্ট -III	৯৭
	শব্দকোশ	৯৮

সম্পদ এবং উন্নয়ন

RESOURCES AND DEVELOPMENT

তোমরা কি বিভিন্ন প্রকার বস্তুর নাম বলতে ও চিহ্নিত করতে পারবে, যা গ্রাম এবং শহরে আমাদের জীবনকে আরামদায়ক করে তুলে ? ওই সকল বস্তুর তালিকা তৈরি করো এবং এগুলোকে তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত পদার্থগুলোর নাম লিপিবদ্ধ করো।

আমাদের পরিবেশে প্রাপ্য প্রত্যেক বস্তু যা আমাদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহৃত হয়, যা প্রযুক্তিগতভাবে সহজলভ্য, অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য, তাকেই ‘সম্পদ’ বলা যেতে পারে।

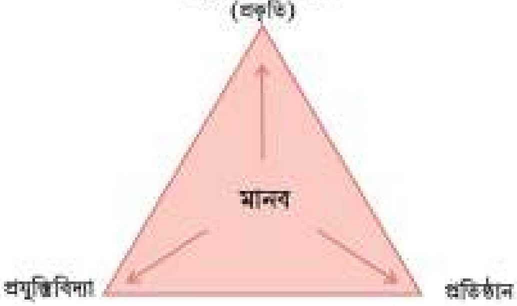

চিত্র 1.1 : প্রকৃতি, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার আন্তঃনির্ভরশীল সম্পর্ক

আমাদের পরিবেশের সহজলভ্য বস্তুসমূহের পরিবর্তন পদ্ধতির মধ্যে প্রকৃতি, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক জড়িত। মানুষ প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করে।

অন্যদের মতো তোমরাও কি মনে কর যে, সম্পদ প্রকৃতির উদার উপহার ? তবে এরকমটা নয়। সম্পদ হচ্ছে মানুষের কার্যাবলির এক পরিণাম। মানুষ স্বয়ং সম্পদের অপরিহার্য উপাদান, তারা আমাদের পরিবেশে প্রাপ্ত পদার্থগুলোকে পরিবর্তন করে সহজলভ্য সম্পদে পরিণত করে এবং ব্যবহার করে। এসব সম্পদকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যেতে পারে —

a) উৎপত্তি অনুসারে - জৈব এবং অজৈব
b) ক্ষয়িষ্ণুতা অনুসারে - নবীকরণযোগ্য এবং অ-নবীকরণযোগ্য
c) মালিকানা অনুসারে - ব্যক্তিগত, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক
d) উন্নয়নের ধারা অনুসারে - সম্ভাব্য, বিকশিত সম্ভার এবং সংরক্ষিত আধার।

চিত্র 1.2 : সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

কাজ

প্রত্যেক বিভাগ থেকে কমপক্ষে দুটো সম্পদকে শনাক্ত করো।

সম্পদের প্রকারভেদ (Types of Resources)

উৎপত্তি অনুসারে (On the Basis of Origin)

জৈব সম্পদ (Biotic Resources) : এসব সম্পদ জীবমণ্ডল থেকে পাওয়া যায় এবং এদের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে যেমন- মানুষ, মৎস, পশুপাখিসহ সমস্ত উদ্ভিদকুল (Flora) এবং প্রাণীকুল (Fauna)।

অজৈব সম্পদ (Abiotic Resources) : সকল সম্পদ যা অজীব বস্তু দ্বারা গঠিত তাদের অজৈব সম্পদ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ - শিলা এবং ধাতুসমূহ।

ক্ষয়িষ্ণুতা অনুসারে (On the Basis of Exhaustibility)

নবীকরণযোগ্য সম্পদ (Renewable Resources) : যেসকল সম্পদ প্রাকৃতিক, রাসায়নিক বা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া দ্বারা পুনরায় নবীকরণ করা যায় বা পুনরায় সৃষ্টি করা যায়, তাদের নবীকরণযোগ্য অথবা পূরণশীল সম্পদ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ - সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তি, জল, বনভূমি এবং বন্যপ্রাণী ইত্যাদি। নবীকরণযোগ্য সম্পদকে আবার নিরবিচ্ছিন্ন অথবা প্রবহমান সম্পদেও ভাগ করা যেতে পারে (চিত্র 1.2)।

অ-নবীকরণযোগ্য সম্পদ (Non-Renewable Resources) : এসকল সম্পদের বিকাশ এক সুদীর্ঘ ভূতাত্ত্বিক সময় ধরে হয়। খনিজ পদার্থ এবং জীবাশ্ম জ্বালানি হল এপ্রকার সম্পদের উদাহরণ। এই সম্পদগুলো সৃষ্টি হতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যায়। কিছু সম্পদ যেমন- ধাতু নবীকরণযোগ্য এবং কিছু সম্পদ যেমন- জীবাশ্ম জ্বালানি অ-নবীকরণযোগ্য যেগুলো ব্যবহারের সাথে সাথে নিঃশেষ হয়ে যায়।

মালিকানা অনুসারে (On the Basis of Ownership)

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পদ (Individual Resources) : এগুলো ব্যক্তির নিজস্ব মালিকানাধীনে থাকে। বহু কৃষকের কাছে সরকার প্রদত্ত ভূমি আছে যার বদলে ওরা সরকারকে রাজস্ব প্রদান করে। গ্রামে বহু মানুষের কাছে জমির মালিকানা রয়েছে, কিন্তু অনেকেই আছে যারা ভূমিহীন। শহরে মানুষ ক্ষুদ্রাকার জমি (Plot), বাড়ি এবং অন্যান্য ভূ-সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করে। বাগান, পশুচারণ ভূমি, পুকুর, কুয়োর জল হল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পদের কতিপয় উদাহরণ। তোমাদের পরিবারের মালিকানাধীন সম্পদগুলোর তালিকা তৈরি করো।

গোষ্ঠীঅধিকৃত সম্পদ (Community Owned Resources) : এমন অনেক সম্পদ রয়েছে যা সমাজের সকলের কাছে সহজসাধ্য হয়। গ্রামের সর্বজনীন জমি (চারণভূমি, শ্মশান ভূমি, গ্রামের পুকুর ইত্যাদি) এবং শহর এলাকার সর্বজনীন পার্ক, পিকনিকস্থল, খেলার মাঠ প্রকৃতপক্ষে সেখানে বসবাসকারী সকল মানুষের জন্যই উন্মুক্ত থাকে।

জাতীয় সম্পদ (National Resources) : মূলত দেশে প্রাপ্ত সকল সম্পদই জাতির জন্য। দেশের সরকারের ব্যক্তিগত সম্পত্তিকেও সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে অধিগ্রহণ করার আইনসম্মত অধিকার আছে। তোমরা রাস্তা, খাল, রেলপথ ইত্যাদি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিতে নির্মিত হতে হয়তো বা দেখেছ। সরকার কর্তৃক নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (Urban Development Authorities) ভূমি অধিগ্রহণের অধিকার দেওয়া আছে। সমুদ্র উপকূল থেকে 1.2 নটিক্যাল মাইল বা 22 কিমি পর্যন্ত অঞ্চলকে জাতীয় জলসীমা (Territorial Water) বলে। এর অন্তর্গত সকল প্রকার খনিজ, জলসম্পদ, বনভূমি, বন্যপ্রাণী এবং রাজনৈতিক সীমানার অন্তর্গত সমস্ত ভূমিভাগ ও মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ দেশের সম্পদ।

আন্তর্জাতিক সম্পদ (International Resources) : আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কিছু কিছু সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করে। উপকূল রেখা থেকে 200 নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone) থেকে অধিক দূরত্বে অবস্থিত সম্পদ উন্মুক্ত মহাসাগরের অন্তর্গত এবং কোনো দেশ এই সম্পদ ব্যবহার করতে পারে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সংগঠন এই সম্পগুলো ব্যবহার করতে অনুমতি প্রদান করে।

তোমরা জান কি ?

তোমরা জান কি যে, ভারতের কাছে স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে দূরে অবস্থিত ভারত মহাসাগরের তলদেশ থেকে ম্যাঙ্গানিজ ভাণ্ডার খনন করার অধিকার রয়েছে। কিছু আন্তর্জাতিক সম্পদ শনাক্ত করো।

বিকাশের স্তর অনুসারে (On the Basis of the Status of Development)

নিরপেক্ষ সম্পদ (Potential Resources) : যে সকল সম্পদ একটি অঞ্চলে পাওয়া যায় কিন্তু এখনও পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি, তাদের নিরপেক্ষ সম্পদ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ- ভারতের পশ্চিমভাগ বিশেষত রাজস্থান এবং গুজরাটে বায়ু ও সৌরশক্তি বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য বিকশিত হয়নি।

বিকশিত সম্পদ (Developed Resources) : এই সম্পদগুলো ব্যাপকভাবে নিরীক্ষণ করা হয়েছে এবং ব্যবহার করার জন্য গুণগত এবং পরিমাণগত মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্পদের বিকাশ প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সম্ভাব্যতার পর্যায়ের ওপর নির্ভর করে।

ভাণ্ডার (Stock) : পরিবেশে উপস্থিত যেসকল পদার্থের মানুষের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে এখনও এগুলো মানুষের নাগালের বাইরে রয়েছে সেগুলোকে ভাণ্ডার বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ- জল হচ্ছে দুইটি গ্যাস যথা হাইড্রোজেন

ও অক্সিজেনের যৌগ। হাইড্রোজেনকে শক্তির মূল উৎস রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার করার মতো উন্নত প্রযুক্তি আমাদের কাছে নেই। তাই একে ভাণ্ডার হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

গচ্ছিত বা সঞ্চিত সম্পদ (Reserves) : এটি ভাণ্ডারেরই অংশবিশেষ, যা বর্তমান প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তাদের ব্যবহার এখনও শুরু হয়নি। এগুলো ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে ব্যবহার করা যেতে পারে। নদীর জলকে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু বর্তমানে এটি শুধুমাত্র সীমিত পরিসরে ব্যবহার করা হচ্ছে। এভাবে বাঁধসমূহের জল, বনভূমি ইত্যাদি হল সঞ্চিত সম্পদ যা ভবিষ্যতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কাজ

তোমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিদ্যমান যেসকল ভাণ্ডার ও সঞ্চিত সম্পদের সাথে তোমরা পরিচিত সেগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

সম্পদের বিকাশ (Development of Resources) : সম্পদ মানুষের জীবনের গুণগত মান বজায় রাখার পাশাপাশি মানুষের অস্তিত্বের জন্যও খুবই প্রয়োজনীয়। এটা বিশ্বাস করা হত যে, সম্পদ প্রকৃতির উদার দান। ফলস্বরূপ, মানুষ এগুলো নির্বিচারে ব্যবহার করতে শুরু করে এবং পরিণামস্বরূপ নিম্নলিখিত প্রধান সমস্যাগুলোর সৃষ্টি হয়—

- কতিপয় ব্যক্তির লোভ চরিতার্থ করার জন্য সম্পদ হানি।
- সমাজে কিছু কিছু ব্যক্তির কাছে সম্পদের পুঞ্জীভবন ঘটে যার ফলে সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে সম্পদ সম্পন্ন এবং সম্পদহীন অথবা ধনী এবং গরিব শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।
- নির্বিচারে সম্পদের অতি ব্যবহারের ফলে বিশ্বব্যাপী বাস্তুসংস্থানগত সমস্যার দিকে ধাবিত করে যেমন- বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global Warming), ওজোন স্তরের হ্রাস পরিবেশ দূষণ এবং ভূমির অবনমন।

কাজ

1) কল্পনা করো, যদি একদিন তৈল সরবরাহ নিঃশেষিত হয়ে যায়, এটি কীভাবে আমাদের জীবনশৈলীকে প্রভাবিত করবে ?

2) গৃহস্থালি/কৃষিকার্য সম্বন্ধীয় আবর্জনাকে পুনর্নবীকরণযোগ্য করার ব্যাপারে মানুষের মনোভাব জানার জন্য তোমার কলোনি/গ্রামে এক জরিপ কার্যের পরিকল্পনা করো। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করবে—
   - তাদের দ্বারা ব্যবহার করা সম্পদগুলোর বিষয়ে ওরা কী চিন্তা করে ?
   - আবর্জনা এবং এর সদ্ব্যবহার সম্পর্কে তাদের মতামত কী ?
   - তোমার কাজের পরিণামগুলোর কোলাজ তৈরি করো।

জীবনের গুণগত মান এবং বিশ্বশান্তি বজায় রাখার জন্য সম্পদের সমবণ্টন খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। বর্তমান কালের মতো যদি কতিপয় ব্যক্তি এবং দেশ দ্বারা সম্পদের হানি চলতে থাকে তাহলে আমাদের গ্রহের ভবিষ্যৎ বিপদসংকুল।

এজন্য সমস্ত প্রকার জীবনের স্থিতিশীল অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। স্থিতিশীল অস্তিত্ব হল স্থিতিশীল উন্নয়নের উপাদান।

স্থিতিশীল উন্নয়ন
(Sustainable Development)

স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থ হচ্ছে 'পরিবেশের ক্ষতিসাধন না করে উন্নয়ন এবং বর্তমান বিকাশ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদার উপেক্ষা না করে।'

রিও ডি জেনেইরো বিশ্ব সম্মেলন, 1992
(Rio de Janeiro Earth Summit, 1992

1992 সালের জুন মাসে 100 থেকেও বেশি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো শহরে প্রথম আন্তর্জাতিক বিশ্ব সম্মেলনের জন্য মিলিত হয়। সম্মেলনটির আয়োজন বিশ্বস্তরে উদ্ভূত পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের জরুরি সমস্যাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। সম্মেলনে সমবেত হওয়া নেতাসমূহ বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন এবং জৈববৈচিত্র্য সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। রিও বিশ্ব সম্মেলন বিশ্ব বনভূমি নীতি সমর্থন করে এবং একবিংশ শতাব্দীতে স্থিতিশীল উন্নয়ন অর্জন করার জন্য এজেন্ডা 21-কে স্বীকৃতি প্রদান করে।

এজেন্ডা 21 (Agenda 21)

এটি 1992 সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো শহরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘ পরিবেশ এবং উন্নয়ন সম্মেলনে (United Nations Conference on Environment and Development) বিশ্ব নেতৃত্বের দ্বারা সাক্ষরিত ঘোষণাপত্র। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়ন অর্জন করা। এটি হল এক এজেন্ডা যা সকলের স্বার্থে পারস্পরিক প্রয়োজন এবং সম্মিলিত দায়িত্ব অনুসারে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার মাধ্যমে পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি, দরিদ্রতা এবং রোগের সাথে একসঙ্গে লড়াই করা। এজেন্ডা 21এর একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, সকল স্থানীয় সরকার তাদের নিজস্ব এজেন্ডা 21এর রূপরেখা গঠন করবে।

সম্পদ পরিকল্পনা (Resources Planing)

পরিকল্পনা হচ্ছে সম্পদের বিচক্ষণ ব্যবহারের জন্য সর্বজনীনভাবে গৃহীত এক কৌশল। এজন্য ভারতের মতো দেশে যেখানে সম্পদের প্রতুলতায় প্রচুর বৈচিত্র্যতা রয়েছে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে যা বিশেষ কিছু সম্পদে সমৃদ্ধ কিন্তু অন্য সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে। এমন কিছু অঞ্চল রয়েছে যাকে সম্পদের প্রাপ্যতার নিরিখে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যেতে পারে এবং এমন কিছু অঞ্চলও রয়েছে যেখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের তীব্র ঘাটতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যসমূহে খনিজ পদার্থ এবং কয়লার মজুত রয়েছে। অরুণাচল প্রদেশে জল সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে কিন্তু গঠনগত উন্নয়নের অভাব রয়েছে। রাজস্থান সৌরশক্তি এবং বায়ুশক্তিতে সমৃদ্ধ কিন্তু জল সম্পদের ঘাটতি রয়েছে। লাডাকের শীতল মরুভূমি দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন। এটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ কিন্তু জল, অন্যান্য পরিকাঠামো এবং মূল্যবান খনিজ পদার্থের অভাব রয়েছে। এজন্য জাতীয়, রাজ্যভিত্তিক, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় স্তরে যথাযথ সম্পদ পরিকল্পনা প্রয়োজন।

কাজ

তোমাদের রাজ্যে প্রাপ্ত সম্পদের তালিকা প্রস্তুত করো এবং ওইসকল সম্পদ শনাক্ত করো যা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তোমাদের রাজ্যে যেগুলোর অভাব রয়েছে।

ভারতে সম্পদের পরিকল্পনা (Resources Planing in India)

সম্পদের পরিকল্পনা হল এক জটিল প্রক্রিয়া যেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত :

a) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্পদ শনাক্ত করে এর তালিকা তৈরি করা। এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত রয়েছে জরিপকার্য, মানচিত্রকরণ এবং সম্পদের গুণগত ও পরিমাণগত অনুমান এবং পরিমাপন।

b) সম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলোকে সঠিকভাবে রূপায়ণের জন্য যথোপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা, দক্ষতা এবং সংস্থাগত গঠনপ্রণালী তৈরি করা।

c) সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমগ্র জাতীয় বিকাশ পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন করা।

স্বাধীনতার পর ভারতে সম্পদ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য স্বার্থক করার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকেই চেষ্টা করা হয়।

খুঁজে বের করো

তোমাদের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়/গ্রাম পঞ্চায়েত/ওয়ার্ড স্তরীয় সম্প্রদায় দ্বারা বেষ্টিত এলাকায় কী কী সম্পদ বিকশিত হচ্ছে ?

কোনো অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য এক প্রয়োজনীয় শর্ত হল সম্পদের প্রাচুর্য, কিন্তু প্রযুক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের তদনুরূপ পরিবর্তনের অভাবে শুধুমাত্র সম্পদের সহজলভ্যতা দ্বারা উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের দেশে এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে যেগুলো সম্পদে সমৃদ্ধ কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে এমন কিছু অঞ্চল রয়েছে যেখানে সম্পদের ভাণ্ডার নগণ্য কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে উন্নত।

তোমরা কি সম্পদে সমৃদ্ধ কিন্তু আর্থিকভাবে অনুন্নত এবং সম্পদহীন কিন্তু আর্থিকভাবে উন্নত অঞ্চলগুলোর নাম বলতে পারবে ? এরূপ অবস্থার কারণগুলো দর্শাও।

ঔপনিবেশিক ইতিহাস ব্যক্ত করে যে, সম্পদে সমৃদ্ধ ঔপনিবেশসমূহ বিদেশি আক্রমণকারীদের কাছে মূল আকর্ষণ ছিল। ঔপনিবেশকারী দেশসমূহ উন্নত প্রযুক্তি বিকাশের দ্বারা সম্পদের শোষণ করে ঔপনিবেশগুলোর ওপর আধিপত্য স্থাপন করে। এজন্য সম্পদ কোনো অঞ্চলের বিকাশে তখনই সহায়ক হয় যখন যথোপযুক্ত প্রযুক্তিগত বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন করা হয়। ঔপনিবেশের বিভিন্ন সময়ে ভারত এসব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এজন্য ভারতে উন্নয়ন বিশেষ করে সম্পদের উন্নয়ন শুধুমাত্র সম্পদের সহজলভ্যতার ওপরই নির্ভরশীল নয়, প্রযুক্তিবিদ্যা, মানবসম্পদের গুণগত মান এবং মানুষের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাও এর অন্তর্ভুক্ত।

সম্পদ সংরক্ষণ (Conservation of Resources) :

যে-কোনো উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সম্পদ খুবই মূল্যবান। কিন্তু সম্পদের অযৌক্তিক এবং মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এই সমস্যাগুলো দূর করার জন্য বিভিন্ন স্তরে সম্পদ সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে এটি বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এবং চিন্তাবিদদের প্রধান চিন্তার কারণ ছিল। উদাহরণস্বরূপ- গান্ধিজি সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে নিজের চিন্তা এইসব শব্দে ব্যক্ত করেন - "আমাদের কাছে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য অনেক কিছু আছে কিন্তু কোনো বিশেষ ব্যক্তির লোভ নির্বাহের জন্য নয়।" তাঁর মতানুসারে বিশ্বস্তরে সম্পদহানির মূল কারণ হল লোভী এবং স্বার্থপর ব্যক্তি এবং আধুনিক প্রযুক্তিরও শোষণমূলক প্রবৃত্তি। তিনি ব্যাপক উৎপাদনের বিপক্ষে ছিলেন এবং এর জায়গায় তিনি মানুষের দ্বারা উৎপাদনের পক্ষে ছিলেন।

1968 খ্রিস্টাব্দে ক্লাব অফ রোম (Club of Rome) আন্তর্জাতিক স্তরে আরও বেশি পদ্ধতিগতভাবে সম্পদ সংরক্ষণের সমর্থন করে। পরবর্তীকালে, 1974 খ্রিস্টাব্দে শুমাখার (Schumacher) তাঁর 'Small is Beautiful' নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে গান্ধিজির দর্শনের পুনরাবৃত্তি করেন। 1987 খ্রিস্টাব্দে ব্রুন্ডল্যান্ড কমিশন (Brundtland Commission) রিপোর্ট দ্বারা বিশ্ব স্তরে সম্পদ সংরক্ষণের মূল ধারণা প্রদান করা হয়। এই রিপোর্টটি 'স্থিতিশীল উন্নয়ন'-এর ধারণা উপস্থাপিত করে এবং সম্পদ সংরক্ষণের সমর্থন করে যা পরবর্তীকালে 'Our Common Future' নামক পুস্তকে প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া 1992 সালে রিও ডি জেনেইরো শহরে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব সম্মেলন' ছিল একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

ভূমিসম্পদ (Land Resources)

আমরা ভূমিতে বাস করি, এখানেই আমরা আমাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করি এবং একে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করি। এভাবে, ভূমি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। স্বাভাবিক উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী, মানবজীবন, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি ভূমিকে অবলম্বন করেই হয়ে থাকে। কিন্তু ভূমি হল এক সীমিত সম্পদ, সেজন্য ব্যবহারযোগ্য ভূমিকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার জন্য যত্নপূর্বক পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক।

ভারতে বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতি যেমন- পর্বত, মালভূমি, সমভূমি এবং দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায়। শতকরা 43 ভাগ জমি সমতলভূমি যা কৃষিকার্য এবং শিল্প বিকাশে সাহায্য করে। দেশের মোট ভূভাগের শতকরা 30 ভাগ পর্বতশ্রেণি, এগুলো কিছু নদীর নিত্যবহতা সুনিশ্চিত করে, পর্যটন এবং বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থার অনুকূল পরিস্থিতি প্রদান করে। দেশের শতকরা 27 ভাগ ভূমি মালভূমি অঞ্চল। এতে খনিজ, জীবাশ্ম জ্বালানি এবং বনজ সম্পদের ভাণ্ডার রয়েছে।

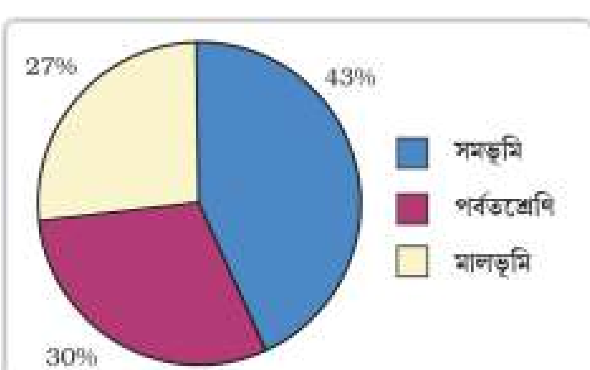

চিত্র 1.3 : ভারত : গুরুত্বপূর্ণ ভূ-প্রকৃতির অন্তর্গত ভূমি।

ভূমির ব্যবহার (Land Utilisation)

ভূমিসম্পদ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় :

1) বনভূমি

2) চাষের জন্য অপর্যাপ্ত জমি

a) অনুর্বর এবং পতিত জমি

b) অ-কৃষিজ ব্যবহারের জন্য বরাদ্দকৃত জমি, যেমন- ইমারত বা দালান, রাস্তা, কলকারখানা ইত্যাদি।

3) অন্যান্য অনাবাদি ভূমি (পতিত জমি ব্যতীত)

a) স্থায়ী তৃণক্ষেত্র এবং পশুচারণভূমি,

b) বিবিধ বৃক্ষজাত ফসল তথা উপবনের অধীন জমি (মোট বপন এলাকায় অন্তর্ভুক্ত নয়),

c) চাষযোগ্য পতিত জমি (5 থেকে অধিক কৃষিজ বছর অকর্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে)।

4) পতিত জমি

a) বর্তমানে পতিত (এক বছর বা তার কম কৃষিজ বছরের জন্য কৃষিকাজ করা হয়নি),

b) বর্তমান পতিত জমি ব্যতীত অন্যান্য জমি (1-5 কৃষিজ বছরের জন্য কৃষিকাজ করা হয়নি)।

5) মোট বপন এলাকা

এক কৃষিজ বছরে এক থেকে বেশি বারের জন্য বপন করা এলাকার সাথে মোট বপন এলাকা যোগ করলে যা পাওয়া যায় তাকে Gross Cropped Area বা 'মোট ফসল এলাকা' বলে।

ভারতে ভূমি ব্যবহারের ধরন (Land Use Pattern in India)

ভারতে ভূমি বা জমির ব্যবহারের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য যেমন- ভূ- প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকার ধরনের পাশাপাশি মানবিক উপাদান যেমন- জনসংখ্যার ঘনত্ব, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ইত্যাদিও যুক্ত রয়েছে।

ভারতের মোট ভৌগোলিক অঞ্চল হল 3.28 মিলিয়ন বর্গকিমি। কিন্তু এর মাত্র 93 ভাগ ভূমিরই ব্যবহারের তথ্য পাওয়া গেছে কেননা উত্তর-পূর্ব ভারতে আসাম ব্যতীত সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলোর ভূমি ব্যবহারের তথ্য সম্পূর্ণভাবে করা হয়নি। সর্বোপরি, পাকিস্তান এবং চিন অধিকৃত কাশ্মীরের কিছু অঞ্চলও জরিপ করা হয়নি।

কাজ

ভূমিব্যবহারের দুটি পাই চিত্র (চিত্র 1.4) এর তুলনা করো এবং 1960-61 থেকে 2008-09 পর্যন্ত মোট বপন এলাকা এবং বনভূমির অন্তর্গত ভূমিতে সীমিত পরিবর্তনই বা কেন এসেছে তা খুঁজে বের করো।

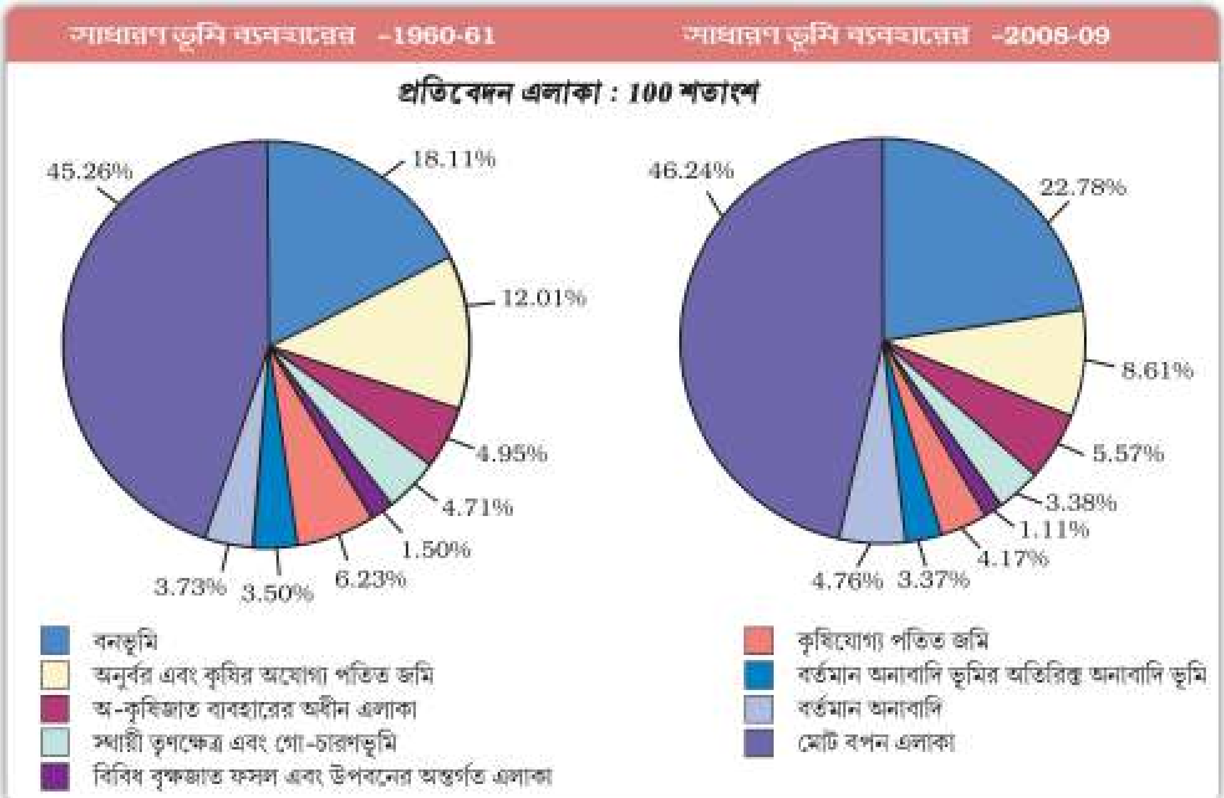

উৎস : *Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture, 2008-09*

চিত্র 1.4

স্থায়ী চারণভূমির অধীন এলাকাও হ্রাস পেয়েছে। আমরা কীভাবে আমাদের বিপুল সংখ্যক গবাদি পশুদের এই চারণভূমিতে ভোজন করাব এবং এর পরিণামই বা কী হবে ? বর্তমান অতিরিক্ত অন্য অনাবাদি ভূমির অধিকাংশই হয়তো বা নিম্নমানের অথবা এইপ্রকার ভূমিতে চাষের খরচ খুব বেশি। একারণেই এপ্রকার জমিগুলোকে দুই থেকে তিন বছরে একবার বা দুইবার কর্ষণ বা চাষ করা হয় এবং এগুলো যদি মোট বপন এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে ভারতে এর পরিমাণ 54 শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে।

মোট বপন এলাকার ধরন বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন হয়। এটি পাঞ্জাব এবং হরিয়ানায় মোট এলাকার শতকরা 80 ভাগ এবং অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, মণিপুর ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে শতকরা 10 ভাগেরও কম।

এসমস্ত রাজ্যগুলোতে মোট বপন এলাকায় কম অনুপাতের কারণসমূহ খুঁজে বের করো।

আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় বনভূমির নীতি (1952) অনুযায়ী মোট ভৌগোলিক এলাকার শতকরা 33 ভাগ বনভূমি থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ভারতের বনভূমির অন্তর্গত জমির পরিমাণ এর চেয়ে অনেক কম। বাস্তুসংস্থানগত সমতা বজায় রাখার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হত। বনভূমির পাশ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা এসকল বনভূমির উপর নির্ভরশীল। ভূমি ব্যবহারের একটি অংশকে পতিত জমি এবং অন্য অংশকে অ-কৃষিজাত ব্যবহারযোগ্য ভূমি বলা হয়। পতিত জমি বলতে প্রস্তরময়, শুষ্ক ও মরুভূমি অঞ্চল এবং অ-কৃষিজাত ব্যবহারযোগ্য ভূমি বলতে বসতি, রাস্তা, রেলপথ, শিল্প ইত্যাদিকে বোঝায়। দীর্ঘসময় ধরে যথাযথ ভূমি সংরক্ষণ এবং তদারকহীনতায় ক্রমাগত ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে ভূমিক্ষয় দেখা যায়। ফলস্বরূপ সমাজ এবং পরিবেশের ওপর গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে।

ভূমির অবনমন এবং সংরক্ষণের উপায়সমূহ (Land Degradation and Conservation Measures)

আমরা আমাদের ভূমি, বিগত প্রজন্মের সাথে ভাগ করেছি এবং আগামী প্রজন্মের সাথেও ভাগ করতে হবে। আমাদের মৌলিক চাহিদা

যথা- খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের 95 শতাংশ ভূমি থেকে অর্জন করি। মানব কার্যাবলির কারণেই শুধুমাত্র ভূমিক্ষয় হচ্ছে না, বরং ভূমিক্ষয়কারী প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকেও তীব্রতর করছে।

বর্তমানকালে ভারতে 130 মিলিয়ন হেক্টর অবক্ষয়িত ভূমি রয়েছে। এর থেকে আনুমানিক শতকরা 24 ভাগ অবক্ষয়িত বনভূমির অন্তর্গত, 56 ভাগ জলাভূমি দ্বারা অবক্ষয়িত এবং বাকি অংশ লবণাক্ত ও ক্ষারকীয় সঞ্চয় দ্বারা অবক্ষয়িত। কিছু মানবিক কার্যাবলি যথা- অরণ্য নিধন, মাত্রাতিরিক্ত পশুচারণ, খননকার্য ইত্যাদি তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভূমিক্ষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

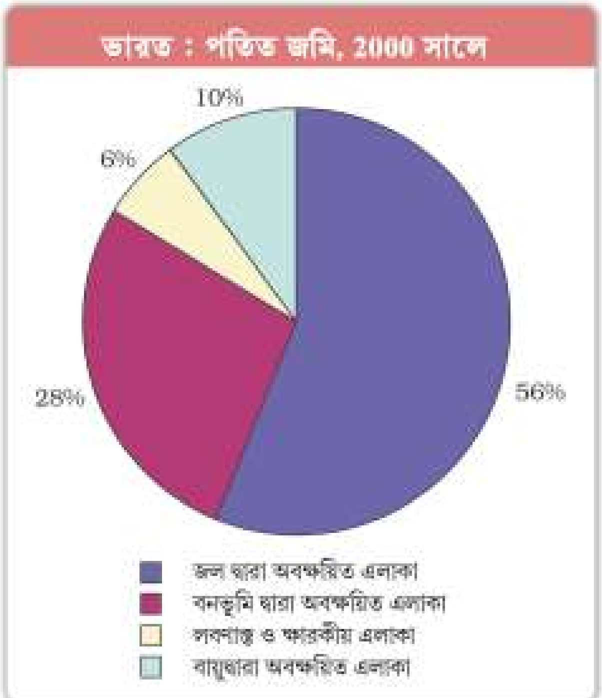

চিত্র 1.5

খননকার্যের পর খনন স্থানগুলো গভীর গর্ত এবং অবশেষ সহ পরিত্যক্ত থেকে যায়। ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যগুলোতে খননকার্যের কারণে অরণ্যনিধনের ফলে তীব্র ভূমিক্ষয় ঘটেছে। গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যগুলোতে ভূমিক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হল মাত্রাতিরিক্ত পশুচারণ। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ প্রভৃতি রাজ্যসমূহে অতিরিক্ত জলসেচ ব্যবস্থার কারণে জলমগ্নতার ফলে মৃত্তিকায় লবণাক্ত এবং ক্ষারকীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। খনিজ প্রক্রিয়াকরণ যেমন সিমেন্ট শিল্পের জন্য ব্যবহৃত চুনাপাথরের চূর্ণ এবং মৃৎশিল্পের জন্য সাজিমাটি (Soapstone) প্রচুর পরিমাণে ধূলিকণা বায়ুমণ্ডলে নির্গত করে। এটি ভূমিভাগে যখন জমে যায় তখন মৃত্তিকায় জলের প্রবেশ্যতায় বাঁধা প্রদান করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের বিভিন্ন ভাগে শিল্পজাত বর্জ্য ভূমি এবং জল দূষণের মূল উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভূমিক্ষয়ের সমস্যা দূর করার বহু উপায় রয়েছে। বনসৃজন এবং পশুচারণের যথার্থ ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ে কিছুটা সাহায্য করতে পারে। উদ্ভিদের আশ্রয়স্থল, মাত্রাতিরিক্ত পশুচারণে নিয়ন্ত্রণ, বালিয়াড়ির ওপর কাঁটাযুক্ত ঝোপঝাড় লাগিয়ে তা স্থিতিশীল বানানো ইত্যাদি হল শুষ্ক অঞ্চলে ভূমিক্ষয় হ্রাস করার কয়েকটি উপায়। শিল্প ও শহরতলি এলাকায় পতিত জমির সঠিক পরিচালনা, খনন কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ, শিল্পজাত পদার্থের সঠিক নির্গমন ও নিস্পত্তি করে ভূমি ও জল দূষণকে হ্রাস করা যেতে পারে।

সম্পদ রূপে মৃত্তিকা (Soil As a Resource)

মৃত্তিকা হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। এটি উদ্ভিদের বৃদ্ধির মাধ্যম এবং পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার জীবগোষ্ঠীর বাঁচার সহায়ক। মৃত্তিকা হচ্ছে একটি সচল প্রণালী। কয়েক সেমি

চিত্র 1.6 : মৃত্তিকা পরিলেখ

গভীর মৃত্তিকা সৃষ্টি হতে লক্ষ বছর সময় লেগে যায়। ভূ-প্রকৃতি, জনক শিলা বা আদি শিলা, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীব এবং সময় ইত্যাদি মৃত্তিকা তৈরির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিসমূহ যেমন- তাপমাত্রার পরিবর্তন, প্রবহমান জলের কার্য, বায়ু এবং হিমবাহ, অনুজীবীদের কার্যাবলি ইত্যাদি মৃত্তিকা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মৃত্তিকায় সংগঠিত হওয়া রাসায়নিক এবং জৈবিক পরিবর্তন উভয়ই সমগুরুত্বপূর্ণ। মৃত্তিকায় জৈব (হিউমাস) এবং অজৈব উপাদানও রয়েছে (চিত্র 1.6)।

মৃত্তিকা গঠনের জন্য দায়ী কারণসমূহ যথা- বর্ণ, গভীরতা, গ্রথন, আয়ু, রাসায়নিক এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে ভারতের মৃত্তিকাগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Soils)

ভারতে বিভিন্ন প্রকার ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, ভূমিরূপ, জলবায়ু অঞ্চল এবং স্বাভাবিক উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার বিকাশে সাহায্য করেছে।

পলি মৃত্তিকা (Alluvial Soils)

এটি সর্বাধিক বিস্তৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ মৃত্তিকা। বাস্তবে সমগ্র উত্তরের সমভূমি পলি মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। এই মৃত্তিকা হিমালয়ের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নদী যথা- সিন্ধু, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীগুলোর সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত হয়েছে। এই মৃত্তিকা এক সংকীর্ণ সংযোগপথ বা অঞ্চল (Corridor) দ্বারা রাজস্থান এবং গুজরাট পর্যন্তও বিস্তৃত। পলিমাটি উপকূলের সমভূমি বিশেষত মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে পাওয়া যায়।

চিত্র 1.7 পলিমাটি

পলি মৃত্তিকা বালি, পলি এবং কাদামাটির মিশ্রণে গঠিত। আমরা যখন নদী মোহনা থেকে নদী উপত্যকার দিকে যেতে শুরু করি তখন মৃত্তিকার কণাগুলো আকারে ক্রমশ বড়ো হতে থাকে। নদী উপত্যকার উপরিভাগে অর্থাৎ ঢালের বিচ্যুতির নিকটবর্তী স্থানগুলোতে এই মৃত্তিকার কণা দানাদার হয়। এই প্রকার মৃত্তিকা পাদদেশীয় সমভূমি যেমন- **ডুয়ার্স, চোস (Chos)** এবং **তরাই** সমভূমি অঞ্চলে সচরাচর দেখা যায়।

মৃত্তিকার কণার আকার অথবা উপাদান ছাড়াও মৃত্তিকাকে তার গঠনের সময়ের ভিত্তিতে বর্ণনা করা যায়। তাদের গঠনের সময় অনুসারে পলিমাটিকে আদি পলিমাটি বা **'ভাঙ্গার'** এবং নবীন পলিমাটি বা **'খাদর'** মৃত্তিকা এই দুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়। 'ভাঙ্গার' মৃত্তিকায় 'খাদর' মৃত্তিকার তুলনায় কাঁকড়ের (Kankar) পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। খাদরে সূক্ষ্ম কণা বেশি থাকে এবং ভাঙ্গারের তুলনায় অধিক উর্বর হয়।

পলিমাটি মোটামুটি খুবই উর্বর প্রকৃতির হয়। এই মৃত্তিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পটাশ, ফসফরিক অ্যাসিড এবং চুন থাকে যা ইক্ষু বা আখ, ধান, গম এবং অন্যান্য খাদ্যশস্য ও ডালজাতীয় শস্য উৎপাদনের জন্য আদর্শ। অধিক উর্বরতাসম্পন্ন হওয়ায় পলিমাটিযুক্ত অঞ্চলগুলোতে নিবিড় চাষ করা হয় এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক লক্ষ করা যায়। শুষ্ক অঞ্চলের মৃত্তিকা অধিক পরিমাণে ক্ষারকীয় হয় এবং যথাযথ পরিচালনা ও জলসেচ ব্যবস্থার সাহায্যে এই মৃত্তিকার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

কৃষ্ণ মৃত্তিকা (Black Soil)

এসমস্ত মৃত্তিকার বর্ণ কালো এবং এটি 'রেগুর' মৃত্তিকা নামেও পরিচিত। 'কার্পাস' উৎপাদনের জন্য কৃষ্ণ মৃত্তিকা আদর্শ এবং এটি 'কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা' নামেও পরিচিত। এটি মানা হয় যে, কৃষ্ণ মৃত্তিকা গঠনের জন্য জলবায়ুগত অবস্থার পাশাপাশি আদি শিলার উপাদানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রকার মৃত্তিকা 'ডেকান ট্র্যাপ' (ব্যাসল্ট) অঞ্চলের নমুনাস্বরূপ যা দাক্ষিণাত্য মালভূমির সমগ্র উত্তর-পশ্চিম

চিত্র 1.8 কৃষ্ণ মৃত্তিকা

ভারত : মৃত্তিকার প্রধান শ্রেণিবিভাগসমূহ

ভাগ জুড়ে বিস্তৃত এবং লাভা প্রবাহ দ্বারা গঠিত হয়েছে। এই মৃত্তিকা মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, মালব, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের মালভূমি সমূহে এবং গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদী উপত্যকা বরাবর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত।

কৃষ্ণ মৃত্তিকা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কণা অর্থাৎ কাদাময় পদার্থ দ্বারা গঠিত। এর আর্দ্রতা ধরে রাখার ক্ষমতা খুব বেশি। উপরন্তু এই মৃত্তিকা ক্যালশিয়াম কার্বনেট, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশ এবং চুন জাতীয় পুষ্টিকর পদার্থে সমৃদ্ধ। এই মৃত্তিকায় সাধারণত ফসফরাসযুক্ত উপাদান খুবই কম থাকে। উষ্ণ ঋতুতে এই মৃত্তিকায় গভীর ফাটলের সৃষ্টি হয় যা মৃত্তিকার বায়ু চলাচলে সাহায্য করে। এই মৃত্তিকা ভিজে গেলে আঠালো হয়ে যায় এবং কাজ করতে অসুবিধা হয়। তাই প্রথম বৃষ্টির পর অথবা প্রাক্ মৌসুমি মরশুমে বা ঋতুতে এই মৃত্তিকাকে তৎকালীন চাষের কাজে লাগানো হয়।

লোহিত এবং পীত মৃত্তিকা (Red and Yellow Soils)

লোহিত মৃত্তিকা দাক্ষিণাত্য মালভূমির পূর্ব এবং দক্ষিণ ভাগের স্ফটিকাকার আগ্নেয় শিলার কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে দেখা যায়। পীত এবং লোহিত মৃত্তিকা ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমির দক্ষিণভাগ, পশ্চিমঘাট পর্বতের পাদদেশেও পাওয়া যায়। কেলাসিত এবং রূপান্তরিত শিলায় লোহার ব্যাপনের ফলে এই মৃত্তিকা লোহিত বর্ণ ধারণ করে। যখন এটি জলযোজিত হয় তখন এটি পীতাভ বর্ণের হয়।

ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা (Laterite Soil)

'ল্যাটেরাইট' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Later' থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ হল 'ইট'। ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে পর্যায়ক্রমিক আর্দ্র ও শুষ্ক ঋতুর ফলে সৃষ্টি হয়। ভারী বর্ষার কারণে অত্যধিক ধৌত প্রক্রিয়ার পরিণাম হল এই মৃত্তিকা। অধিকাংশ

চিত্র 1.9 : ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা

ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা অনেক গভীরতায় পাওয়া যায় এবং আম্লিক ($PH<6.0$) হয়। এই মৃত্তিকাতে সাধারণত উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক পুষ্টিকর পদার্থ কম থাকে। এই মৃত্তিকার অধিকাংশই দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পাওয়া যায়। যেখানে এই মৃত্তিকা পর্ণমোচী এবং চিরহরিৎ বনভূমির বিকাশে সাহায্য করে, সেখানে এই মৃত্তিকা হিউমাস সমৃদ্ধ হয়। সাধারণত প্রায় শুষ্ক পরিবেশে এরূপ মৃত্তিকায় হিউমাস কম মাত্রায় পাওয়া যায়। ভূমিরূপের অবস্থান অনুযায়ী এই মৃত্তিকায় ক্ষয় ও অবনমনের প্রবণতা দেখা যায়। কর্ণাটক, কেরালা এবং তামিলনাড়ুর পার্বত্য অঞ্চলে মৃত্তিকা সংরক্ষণের সঠিক উপায় অবলম্বন করে এই মৃত্তিকাকে চা ও কফি উৎপাদনের উপযোগী করা হয়েছে। লোহিত ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কেরালায় কাজুবাদাম চাষের পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

শুষ্ক মৃত্তিকা (Arid Soil)

শুষ্ক মৃত্তিকা লাল থেকে বাদামি বর্ণের হয়। এই মৃত্তিকা সাধারণত গঠন অনুসারে বালুকাময় এবং প্রকৃতিতে লবণাক্ত। কিছু কিছু অঞ্চলে লবণের মাত্রা খুব বেশি এবং জল বাষ্পীভূত করে সাধারণ লবণ পাওয়া যায়। শুষ্ক জলবায়ু ও উচ্চ তাপমাত্রার কারণে বাষ্পীভবনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং এই মৃত্তিকায় হিউমাস ও আর্দ্রতার মাত্রা কম থাকে। নিম্নস্তরের মৃত্তিকায় কাঁকর পাওয়া যায় কেননা মৃত্তিকার যত নিম্নস্তরে যাওয়া যায় ক্যালশিয়ামের মাত্রা ততই বাড়তে থাকে। সর্বনিম্ন 'কাঁকর' স্তরটি জলের প্রবেশ্যতায় বাঁধা প্রদান করে। সঠিক সেচব্যবস্থা দ্বারা পশ্চিম রাজস্থানের মতো জলসেচের মাধ্যমে এই প্রকার মৃত্তিকাকে কৃষিযোগ্য করা যেতে পারে।

চিত্র 1.10 : শুষ্ক মৃত্তিকা

অরণ্য মৃত্তিকা (Forest Soil)

পাহাড়ি এবং পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ষাপ্রবণ বনভূমি অবস্থিত সেখানে এই মৃত্তিকা পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকা

গঠনে পার্বত্য পরিবেশ অনুসারে পরিবর্তন আসে, যেখানে এগুলো সৃষ্টি হয়। নদী উপতক্যায় এই মৃত্তিকা দোআঁশ ও পলিময় এবং উর্ধ্ব ঢালে এর গঠন স্থূল দানাযুক্ত হয়। হিমালয়ের বরফাবৃত অঞ্চলে এই মৃত্তিকার নগ্নীভবন বেশি হয় যা আম্লিক ও কম হিউমাস সমৃদ্ধ। উপত্যকার নিম্নভাগে বিশেষত নদীমঞ্চ এবং পলল ব্যজনীতে প্রাপ্ত মৃত্তিকা উর্বর হয়।

মৃত্তিকা ক্ষয় এবং মৃত্তিকা সংরক্ষণ (Soil Erosion and Soil Conservation)

মৃত্তিকার আবরণের নগ্নীভবন এবং এর অপসারণকে মৃত্তিকা ক্ষয় বলা হয়। মৃত্তিকা গঠন এবং ক্ষয়ের প্রক্রিয়াসমূহ একসঙ্গে কাজ করে এবং সাধারণত উভয়ের মধ্যে সমতা থাকে। কখনো-কখনো এই সমতা মানবিক কার্যাবলি দ্বারা যেমন- অরণ্যনিধন, অত্যধিক পশুচারণ, নির্মাণকার্য ও খননকার্য ইত্যাদি দ্বারা বিঘ্নিত হয়, যেখানে প্রাকৃতিক শক্তি যথা- বায়ু, হিমবাহ এবং জলপ্রবাহ মৃত্তিকা ক্ষয় করে। জলপ্রবাহ কাদামাটিকে কর্তন করে এবং সুগভীর খাত তৈরি করে থাকে যাকে ‘গালি (Gullies)’ বলে। ভূমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে যা ‘উৎখাত ভূমি (Bad Land)’ নামে পরিচিত। চম্বল অববাহিকায় এ প্রকার ভূমিকে র‍্যাভাইন (Ravine) বলা হয়। কখনো-কখনো

চিত্র 1.10 : ‘গালি’ বা প্রণালী ক্ষয়

জল ঢালের নীচে চাদরের অনুরূপ এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত হয়। এক্ষেত্রে মৃত্তিকার উর্ধ্বস্তর জলের সাথে ধৌত হয়ে যায়, একে ‘পাত ক্ষয় (Sheet Erosion)’ বলা হয়। বায়ু দ্বারা সমভূমি অথবা ঢালু ভূমি থেকে মৃত্তিকা প্রবাহিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বায়ুর ক্ষয়কার্য বলা হয়। ত্রুটিপূর্ণ কৃষি পদ্ধতির কারণেও মৃত্তিকা ক্ষয় ঘটে। ভুল পদ্ধতিতে চাষ করা হলে, যথা- ঢালের উপর থেকে নীচের দিকে, তাহলে খাত (Channel) গঠিত হয়, ফলে জল তীব্র গতিতে প্রবাহিত হয় যা মৃত্তিকা ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে।

চিত্র 1.11 : মৃত্তিকা ক্ষয়

সমোন্নতিরেখা বরাবর চাষ করলে ঢালের সাথে জলপ্রবাহের গতি হ্রাস পায়। একে সমোন্নতিরেখা বরাবর চাষ (Contour Ploughing) বলে। ঢাল বরাবর ধাপ কেটে সোপান তৈরি করা যেতে পারে। ধাপ চাষ মৃত্তিকা ক্ষয়কে নিয়ন্ত্রিত করে। পশ্চিম এবং মধ্য হিমালয়ে ধাপ চাষ খুব উন্নত। বিশাল ভূখণ্ডগুলোকে ছোটো ছোটো ফালিতে বিভক্ত করে। ফসলের মাঝে মাঝে ঘাসের সারি লাগানো হয়। এতে বায়ুর শক্তি হ্রাস পায়। এই পদ্ধতিকে ফালি চাষ (Strip Cropping) বলে। অনুরূপভাবে একনাগাড়ে বৃক্ষরোপণ করে ছায়া সৃষ্টির মাধ্যমে একই কাজ করা হয়। এরূপ গাছের সারিকে ছায়া বলয় (Shelter Belts) বলা হয়। এই ছায়াবলয়সমূহ পশ্চিম ভারতে বালিয়াড়ির এবং মরুভূমির স্থিতিশীলতায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে।

ভারতের পরিবেশের অবস্থা (State of India’s Environment)

- সুখোমাজরি গ্রাম এবং ঝাবুয়া জেলা দেখিয়েছে যে, ভূমিক্ষয়কে দূর বা বাতিল করা যেতে পারে। সুখোমাজরি গ্রামে বৃক্ষের ঘনত্ব 1976 সালে হেক্টর প্রতি 13 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 1992 সালে হেক্টর প্রতি 1272-এ দাঁড়িয়েছিল।
- পরিবেশের পুনরুজ্জীবনের ফলে অধিক সম্পদ প্রাপ্যতা, উন্নত কৃষি এবং পশুপালনের পরিণামস্বরূপ অর্থনৈতিক উন্নতি বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে। সুখোমাজরি গ্রামে 1979 থেকে 1984 সালের মধ্যে পরিবারের গড় বার্ষিক আয় 10,000 টাকা থেকে 15,000 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

➲ বাস্তুতান্ত্রিক পুনঃস্থাপনের জন্য মানুষের দ্বারা পরিবেশের সঠিক পরিচালনা আবশ্যক। মধ্যপ্রদেশ সরকার সাধারণ মানুষকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার প্রদান করেছে। যার ফলে 2.9 লক্ষ হেক্টর অথবা ভারতের শতকরা 1 ভাগ ভূমি জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনা দ্বারা সবুজায়ন করা হয়েছে।

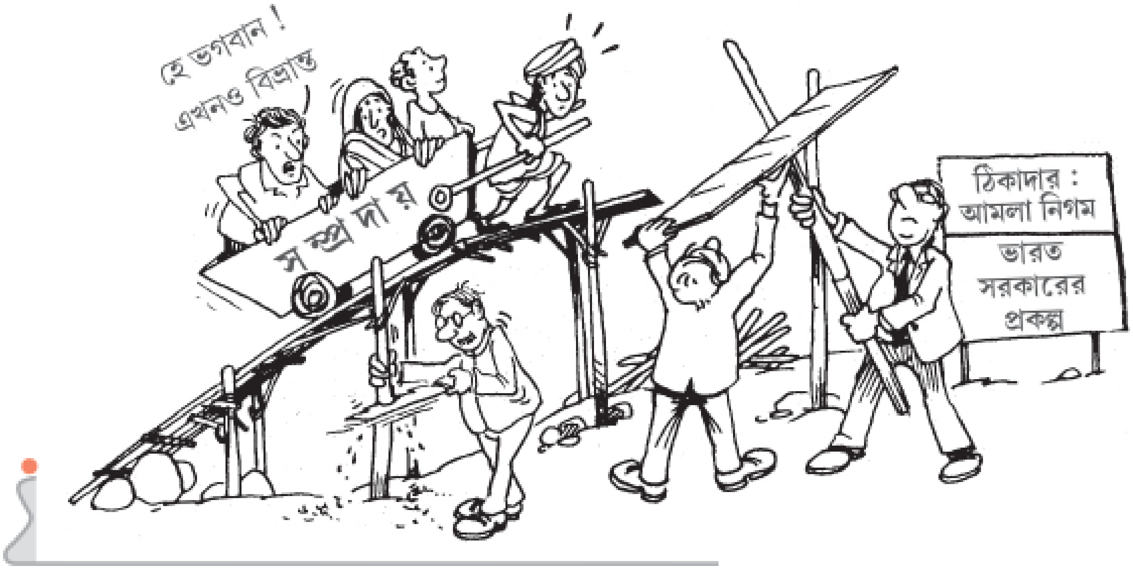

উৎস : *The Citizens' Fifth Report,1999 Centre of Science and Environment (CSE), New Delhi*

অনুশীলনী অনুশীলনী **অনুশীলনী** অনুশীলনী অনুশীলনী

1. **সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :**

(i) লৌহ আকরিক নিম্নলিখিত কোন্ প্রকার সম্পদ ?

(a) নবীকরণযোগ্য (c) প্রবহমান

(b) জৈব (d) অনবীকরণযোগ্য

(ii) জোয়ারভাটা শক্তি নিম্নলিখিত কোন্ প্রকার সম্পদ নয় ?

(a) পূরণশীল (c) অজৈব

(b) মানব সৃষ্ট (d) অপুনর্নবীকরণযোগ্য

(iii) নিম্নলিখিত কারণগুলোর মধ্যে পাঞ্জাবে ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ হল-

(a) নিবিড় চাষ (c) অত্যধিক জলসেচ

(b) অরণ্যনিধন (d) অত্যধিক পশুচারণ

(iv) নিম্নলিখিত কোন্ রাজ্যে 'ধাপ চাষ' করা হয় ?

(a) পাঞ্জাব (c) হরিয়ানা

(b) উত্তর প্রদেশের সমভূমি (d) উত্তরাখণ্ড

(v) নিম্নলিখিত কোন্ রাজ্যে প্রধানত কৃষ্ণ মৃত্তিকা পাওয়া যায় ?

(a) জম্মু ও কাশ্মীর (c) রাজস্থান

(b) মহারাষ্ট্র (d) ঝাড়খণ্ড

2. **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :**
   (i) কৃষ্ণ মৃত্তিকা পাওয়া যায় এমন যে-কোনো তিনটি রাজ্যের নাম লেখো এবং এই মৃত্তিকায় মূলত কী কী শস্যচাষ করা হয় ?
   (ii) পূর্ব উপকূলের ব-দ্বীপ এলাকায় কোন্ প্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায় ? এই প্রকার মৃত্তিকার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লেখো।
   (iii) পার্বত্য এলাকায় মৃত্তিকা ক্ষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে ?
   (iv) জৈব এবং অজৈব সম্পদ কাকে বলে ?

3. **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 120 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :**
   (i) ভারতে ভূমি ব্যবহারের ধরন বর্ণনা করো এবং কেন 1960-61 খ্রিস্টাব্দ থেকে বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি ?
   (ii) কীভাবে প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক উন্নতির কারণে সম্পদের অধিক ব্যবহার হয়েছে ?

প্রকল্প/কাজ (PROJECT/ACTIVITY)

1. তোমাদের এলাকায় সম্পদের ব্যবহার এবং সংরক্ষণের ওপর একটি প্রকল্প তৈরি করো।
2. তোমাদের বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত বহুবিধ সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত করো।
3. কল্পনা করো, যদি তৈল সরবরাহ নিঃশেষিত হয়ে যায়, তাহলে এটি কীভাবে আমাদের জীবনশৈলীকে প্রভাবিত করবে ?
4. নিম্নলিখিত ধাঁধাতে অনুভূমিক এবং উল্লম্ব দিকে অন্তর্নিহিতউত্তর বের করো।
   (নোট : ধাঁধার উত্তর ইংরেজি শব্দে দেওয়া আছে)

S	F	G	S	F	O	B	R	O	M	S	U	A	P	J
Q	G	A	F	F	O	R	E	S	T	A	T	I	O	N
P	N	R	E	C	P	R	S	L	D	M	I	L	N	F
S	N	A	T	Q	X	U	O	V	A	I	O	L	A	L
O	D	E	I	D	R	J	U	J	L	D	B	N	B	D
T	G	H	M	I	N	E	R	A	L	S	A	X	M	W
B	V	J	K	M	E	D	C	R	U	P	F	M	H	R
L	A	T	E	R	I	T	E	M	V	A	Z	T	V	L
A	B	Z	O	E	N	M	F	T	I	S	D	L	R	C
C	G	N	N	S	Z	I	O	P	A	X	T	Y	J	H
K	J	G	K	D	T	D	C	S	L	S	E	G	E	W

(i) ভূমি, জল, স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং খনিজরূপে প্রাকৃতিক সম্পদ।
(ii) অনবীকরণযোগ্য সম্পদের একটি ধরন।
(iii) উচ্চ জলধারণক্ষমতা বিশিষ্ট মৃত্তিকা।
(iv) মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের ধৌতপ্রক্রিয়ায় অত্যধিক নিষ্কাশিত মৃত্তিকা।
(v) মৃত্তিকাক্ষয় রোধ করার জন্য বৃহদাকারে বৃক্ষরোপণ।
(vi) ভারতের বৃহৎ সমভূমি এই মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত।

বন ও বন্যপ্রাণী সম্পদ

FOREST AND WILDLIFE RESOURCES

2

নারক ! হে প্রভু, লেপচাদের পৃথিবীতে তুমিই সংগীতের জনক
হে নারক ! হে প্রভু, আমাকে স্বয়ং তোমার নিকট উৎসর্গ করতে দাও
তুমি আমাকে ঝরনা, নদী, পর্বত, বন, কীটপতঙ্গ এবং প্রাণী থেকে তোমার সংগীত আহরণ করতে দাও
তুমি আমাকে মধুর মৃদুমন্দ বাতাস থেকে তোমার সংগীত আহরণ করতে দাও এবং একে তোমার কাছে উৎসর্গ করতে দাও।

উৎস : পশ্চিমবঙ্গের উত্তরভাগের লেপচা লোকসংগীত

এই গ্রহে আমরা আণুবীক্ষণিক জীব ও ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে, শৈবাল থেকে বটগাছ, হাতি ও নীল তিমি পর্যন্ত কোটি কোটি অন্যান্য জীবদের সাথে বাস করি। আমাদের এই বাসস্থানগুলো অত্যধিক জৈববৈচিত্র্যে ভরপুর। সকল জীবকুলসহ আমরা মানবরা বাস্তুতান্ত্রিক পদ্ধতির একটি জটিল জাল গঠন করি যেখানে আমরা এর একটি অংশ মাত্র এবং আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এই পদ্ধতির ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের শ্বাস গ্রহণের বায়ু, পানীয় জল এবং মাটি যা আমাদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করে, যাকে ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না, এইগুলো সবকিছুই উদ্ভিদ, প্রাণী ও জীবাণুরা পুনরায় সৃষ্টি করে। বনভূমি বাস্তুতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ তারাও প্রাথমিক উৎপাদক যাদের ওপর অন্য সকল জীবরা নির্ভরশীল।

বন্যজীবন ও কৃষিজ ফসলের প্রজাতিতে অত্যধিক **জৈববৈচিত্র্য বা জীববিদ্যা সংক্রান্ত বৈচিত্র্য** দেখা যায়, তাদের গঠন ও কাজে বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও অন্তঃনির্ভরতার এক জটিল জালের মাধ্যমে একটি পদ্ধতিতে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে।

ভারতের উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল (Flora and Fauna in India)

যদি তোমরা চারপাশে তাকাও, তোমরা এমন কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদ খুঁজে পাবে যেগুলো একমাত্র তোমাদের এলাকায় পাওয়া যায়। বাস্তবে, জৈববৈচিত্র্যের বিশাল বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর সমৃদ্ধ দেশসমূহের মধ্যে ভারত একটি দেশ। সারা পৃথিবীর মোট প্রজাতির শতকরা প্রায় 8 ভাগ (আনুমানিক 1.6 মিলিয়ন) প্রজাতি ভারতে আছে। এটি এখনও সম্ভবত খুঁজে না পাওয়া প্রজাতির দ্বিগুণ বা তিনগুণ হবে। তোমরা ইতোমধ্যে ভারতের বন ও বন্যপ্রাণী সম্পদের বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিশদভাবে পড়েছ। তোমরা অনুভব করে থাকবে যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এইসব সম্পদগুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, তাদের অবদান আমরা প্রায় স্বীকারই করি না। কিন্তু আমাদের পরিবেশের প্রতি অসংবেদনশীলতার কারণে ইদানীং কালে এই সম্পদগুলো ভীষণ চাপের সম্মুখীন।

তোমরা জান কি ?

এই দেশে এখন পর্যন্ত প্রাণীকুলের 81,000 এবং উদ্ভিদকুলের 47,000 এর অধিক প্রজাতি পাওয়া গেছে। আনুমানিক 47,000 উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে প্রায় 15,000 ফুলগাছের প্রজাতি ভারতের নিজস্ব (স্থানীয়) প্রজাতি।

কাজ

তোমাদের এলাকায় মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প খুঁজে বের করো।

কিছু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, ভারতের লিপিবদ্ধ বন্য উদ্ভিদকুলের ন্যূনতম শতকরা 10 ভাগ এবং স্তন্যপায়ীদের শতকরা 20 ভাগ বিপন্ন তালিকায় রয়েছে। এদের মধ্যে অনেক প্রজাতি এখন ‘সংকটাপন্ন’ শ্রেণিতে রয়েছে, যারা বিলুপ্ত হওয়ার পথে যেমন- চিতা, গোলাপি মাথাযুক্ত হাঁস, পাহাড়ি কোয়েল, জংলি চিত্রাকার উল্লুক এবং উদ্ভিদ যেমন- মধুকা ইনসিগনিস (মহুয়ার এক বন্য প্রকারভেদ)

এবং হুব্বারডিয়া হেপ্টানিউরোন (ঘাসের একটি প্রজাতি)। বাস্তবে কেউ বলতে পারবে না কত সংখ্যক প্রজাতি ইতোমধ্যে হারিয়ে গেছে। আজ আমরা শুধুমাত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে এমন বড়ো এবং অধিক দেখা যায় প্রাণী ও উদ্ভিদ নিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু ছোটো প্রাণী যেমন- পতঙ্গ এবং উদ্ভিদের প্রতি কোনো নজর দিই কি ?

তোমরা জান কি ?

তোমরা জান কি ভারতের বড়ো প্রাণীদের তথা স্তন্যপায়ীদের 79টি প্রজাতি, পাখিদের 44টি প্রজাতি, সরীসৃপদের 15টি প্রজাতি এবং উভয়চরদের 3টি প্রজাতি সংকটাপন্ন ? 1500 এর কাছাকাছি উদ্ভিদ প্রজাতি বিপন্ন বলে মনে করা হয়। ইতোমধ্যে ফুলগাছ এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিলুপ্তির হার প্রত্যাশিত হারের চেয়ে প্রায় 50 থেকে 100 গুণ বেশি।

বিলুপ্তির পথে অরণ্য (Vanishing Forests)

ভারতে যে মাত্রায় বন ধ্বংস হচ্ছে তা উদ্বেগজনক। দেশের আনুমানিক 79.42 মিলিয়ন হেক্টর ভূমি বন ও গাছপালায় ঢাকা যা দেশের মোট ভৌগোলিক আয়তনের শতকরা 24.16 ভাগ। এর মধ্যে শতকরা 12.2 ভাগ গভীর অরণ্য, 9.4 ভাগ মুক্ত অরণ্য এবং 0.14 ভাগ ম্যানগ্রোভ জাতীয় অরণ্য। 2015 সালে দেশের বনবিভাগের প্রতিবেদন (State of forest report) অনুসারে, 2013 সাল থেকে গভীর অরণ্যের বিস্তার 3,775 বর্গ কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। যাই হোক, অরণ্যের এই আপাত বৃদ্ধি বিভিন্ন সংগঠন দ্বারা সংরক্ষণ পদক্ষেপ, পরিচালন হস্তক্ষেপ, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি কারণে সম্ভবপর হয়েছে।

চিত্র 2.1

চলো, এখন আমরা বর্তমানে যাদের অস্তিত্ব আছে এমন বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। ইন্টার ন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল (IUCN) এর ওপর ভিত্তি করে আমরা নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন প্রজাতিকে শ্রেণিবিভক্ত করতে পারি —

সাধারণ প্রজাতি (Normal Species) : প্রজাতিদের মধ্যে যাদের সংখ্যাস্তর বেঁচে থাকার জন্য স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয়, তাদেরকে সাধারণ প্রজাতি বোঝায়। যেমন- পশু, শাল, পাইন, রোডেন্টস ইত্যাদি।

বিপন্ন প্রজাতি (Endangered Species) : এরা এমন প্রজাতি যাদের বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেসব প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, যদি এগুলো অনবরত চালু থাকে, তাহলে এরূপ প্রজাতির বেঁচে থাকা কঠিন। কৃষ্ণসার মৃগ, কুমির, ভারতীয় জংলি গাধা, ভারতীয় গন্ডার, সিংহ-ল্যাজযুক্ত বানর, সাংগাই (মণিপুরি হরিণ) প্রভৃতি এরূপ প্রজাতির উদাহরণ।

দুর্বল প্রজাতি (Vulnerable Species) : এরা এমন প্রজাতি যাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। যদি তাদের সংখ্যাস্তরের ওপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তারকারী পরিস্থিতির পরিবর্তন করা না যায় এবং তাদের সংখ্যা হ্রাস হতেই থাকে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে তারা বিপন্ন প্রজাতির শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। নীল ভেড়া, এশীয় হাতি, গাঙ্গেয় ডলফিন ইত্যাদি দুর্বল প্রজাতির উদাহরণ।

বিরল প্রজাতি (Rare Species) : বিরল প্রজাতির সংখ্যা খুবই কম। যদি তাদের ওপর অনবরত প্রতিকূল প্রভাব পড়তে থাকে, তাহলে তারাও বিপন্ন কিংবা দুর্বল প্রজাতির শ্রেণিতে চিহ্নিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, হিমালয়ের খয়েরি ভালুক, এশীয় বন্য ষাঁড়, মরুভূমির শেয়াল ও ধনেশ পাখি ইত্যাদি।

স্থানীয় প্রজাতি (Endemic Species) : এরা এমন প্রজাতি, একমাত্র প্রাকৃতিক অথবা ভৌগোলিক সীমানা থেকে পৃথক এমন কিছু বিশেষ অঞ্চলে সাধারণত পাওয়া যায়। আন্দামানের টিল (Teal), নিকোবরের পায়রা, আন্দামানের বন্য শূকর, অরুণাচল প্রদেশের মিথুন প্রভৃতি এ ধরনের প্রজাতির উদাহরণ।

বিলুপ্ত প্রজাতি (Extinct Species) : প্রজাতিদের মধ্যে যাদের যে অঞ্চলে বা বাসস্থানে থাকার কথা সেখানে অনুসন্ধান করেও আর খুঁজে পাওয়া যায় না, তাদের বিলুপ্ত প্রজাতি বোঝায়। এ ধরনের প্রজাতি কোনো স্থানীয় অঞ্চল, রাজ্য, দেশ, মহাদেশ কিংবা সমগ্র পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এরূপ প্রজাতির উদাহরণ হল এশীয় চিতা, গোলাপি মাথাযুক্ত হাঁস ইত্যাদি।

চিত্র 2.2 : কিছু বিলুপ্ত, বিরল ও বিপন্ন প্রজাতি

এশীয় চিতা : কোথায় এরা হারিয়ে গেল
(Asiatic Cheetah : Where did they go ?)

ভূমিতে বসবাসকারী পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী স্তন্যপায়ী প্রাণী চিতা, বিড়াল প্রজাতির এক অনন্য ও বিশিষ্ট সদস্য যে ঘণ্টায় 112 কিলোমিটার গতিতে দৌড়াতে পারে। চিতাকে প্রায়শই ভুল করে চিতা বাঘ বলে মনে করা হয়। চোখ থেকে নাকের দুই পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়া চোখের জলের রেখা দেখে এই ধরনের চিতাকে চিহ্নিত করা যায়। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চিতাদের মুক্তাঞ্চল ছিল। বাসস্থান ও শিকারের প্রাচুর্য কমে যাওয়ায় আজ এশীয় চিতারা বিলুপ্তির পথে। ভারতে বহু আগে, 1952 সালে এই প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করা হয়।

কী কী প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের এ ধরনের ভয়ানক হ্রাস হয়েছে ?

যদি তোমরা চারদিকে তাকাও, তোমরা খুঁজে পাবে কীভাবে আমরা সম্পদ আহরণের জন্য প্রকৃতিকে পরিবর্তন করেছি। আমরা কাঠ, ছাল, পাতা, রবার, ঔষধ, রঞ্জক, খাদ্য, জ্বালানি, পশুখাদ্য, জৈবসার ইত্যাদি দ্রব্য বন ও বন্যপ্রাণী থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পাই। এইজন্য আমরা নিজেরাই বন ও বন্যপ্রাণীর ক্ষতি করে চলেছি। ঔপনিবেশিক কালে রেলপথ, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজ্ঞানভিত্তিক বনায়ন এবং খনন কার্যের সম্প্রসারণের ফলে ভারতীয় বনের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। এমনকি স্বাধীনতা লাভের পরেও, অনবরত কৃষির সম্প্রসারণ বনজ সম্পদের ক্ষতির একটি প্রধান কারণ। ভারতের বন সমীক্ষা অনুসারে, 1951 এবং 1980 সালের মধ্যে সারা ভারতে 26,200 বর্গ কিলোমিটারের অধিক বনাঞ্চল কৃষি জমিতে পরিবর্তন করা হয়েছিল। অধিকাংশ জনজাতি বসবাসকারী অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ও মধ্য ভারতে স্থানান্তর চাষ (জুমচাষ) এক ধরনের ‘কর্তন ও দহন’ (Slash and burn) কৃষির প্রয়োজনে গাছ কেটে বন ধ্বংস করা হয়।

ঔপনিবেশিক বন নীতিসমূহকে কি দোষী করা যায় ?
(Are colonial forest policies to be blamed ?)

আমাদের কয়েকজন পরিবেশবিদ বলেন যে, বিদ্রুপাত্মক পরিভাষা “সমৃদ্ধ বৃক্ষরোপণ” এর মাধ্যমে ভারতের অনেক অঞ্চলে কিছু সুবিধাজনক প্রজাতির বৃক্ষের উন্নতি ঘটেছে। এই পদ্ধতিতে একমাত্র বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান প্রজাতির বৃক্ষের বেশি পরিমাণে রোপণ করা হয়েছিল এবং অন্য প্রজাতির বৃক্ষের ধ্বংস হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, শাল বৃক্ষের

একচেটিয়া রোপণে দক্ষিণ ভারতের প্রাকৃতিক বন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং হিমালয়ের চির পাইন (*Pinus roxburghii)* রোপণ, হিমালয়ান ওক (*Quercius* spp.) ও রোডোডেনড্রন বনের স্থানান্তরিত করেছে।

বৃহদায়তনের বিকাশ প্রকল্পগুলোও তাৎপর্যপূর্ণভাবে বনের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে। 1951 সালে, নদী উপত্যকা প্রকল্পের জন্য 5000 বর্গ কিলোমিটারের অধিক বন কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বন পরিষ্কারের কাজ আজও অনবরত চলছে, যেমন- মধ্যপ্রদেশের নর্মদা সাগর প্রকল্পে 40,000 হেক্টরের বন প্লাবিত হয়ে যাবে। বন ধ্বংসের পশ্চাতে খননকার্য অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। ডলোমাইট খনন কার্যের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ মারাত্মকভাবে বিপদগ্রস্ত। এটি অনেক প্রজাতির প্রাকৃতিক বাসস্থানের ক্ষতি করেছে এবং বৃহৎ ভারতীয় হাতি সহ অন্যান্য কয়েকটি প্রজাতির একস্থান থেকে অন্য নতুন স্থানে যাওয়ার পথে বাঁধার সৃষ্টি করেছে।

অনেক বনকর্মী এবং পরিবেশবিদ মনে করেন যে, বন সম্পদ হ্রাস পাওয়ার পশ্চাতে পশুচারণ ও জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ হল মুখ্য ক্ষতিকারক প্রভাবক। যদিও, তাদের মন্তব্যে কিছু সত্যতা থাকতে পারে, তথাপি একটি প্রশ্ন থেকে যায়, অধিকাংশ জ্বালানি ও পশুখাদ্যের চাহিদা মেটানো হয় গাছ ছেঁটে ফেলা ডালপালার মাধ্যমে, না কি সম্পূর্ণ গাছ কেটে ফেলার মাধ্যমে। বনের বাস্তুতন্ত্র কিছু দেশের অত্যন্ত মূল্যবান বনজ দ্রব্য, খনিজ এবং অন্যান্য সম্পদের ভাণ্ডার যা শিল্পপণ্যোৎপাদী নগরের অর্থব্যবস্থার দ্রুত বিকাশের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সংরক্ষিত অঞ্চলগুলোর সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকে এবং বিভিন্ন মানুষের দ্বন্দ্বের জন্যই অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করে।

সংকটে হিমালয়ের ইউ
(The Himalayan Yew in trouble)

হিমালয়ের কৃষ্ণবর্ণের পত্রযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষ ইউ (Taxus wallachiana) এক প্রকার ঔষধি গাছ যা হিমাচল প্রদেশ ও অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন ভাগে দেখা যায়। এই গাছের ছাল, পাতা, পল্লব, মূলে 'ট্যাক্সল(Taxol)' নামে একপ্রকার রাসায়নিক যৌগ পাওয়া যায় যা কিছু ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধ ক্যান্সারের প্রতিষেধক হিসাবে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বিক্রয় হয়। এই গাছ থেকে অধিক পরিমাণে ঔষধ নিষ্কাশনের জন্য এই গাছের অস্তিত্ব সংকটে। বিগত এক দশকে হিমাচল প্রদেশ ও অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন ভাগে হাজার হাজার ইউ গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে।

শান্ত উপত্যকায় মুখালি নার্সারিতে জনজাতি যুবতিরা বাঁশের চারা রোপণ করছে।

জনজাতি মহিলারা ছোটো ছোটো বনজ দ্রব্য বিক্রয় করছে।

জনজাতি মহিলারা শুষ্ক তৃণ জড়ো করে নিয়ে যাচ্ছে।

চিত্র : 2.3

বাসস্থানের ধ্বংস, শিকার, অনধিকার প্রবেশ (Poaching), মাত্রাতিরিক্ত শোষণ (Over-exploitation), পরিবেশ দূষণ, বিষাক্তকরণ ও দাবানল প্রভৃতি প্রভাবক ভারতের জৈববৈচিত্র্যকে পতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পরিবেশ বিনাশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণের মধ্যে সম্পদের অসম বণ্টন, সম্পদের অসম উপভোগ, পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্বের অংশীদারিত্বে অসমতাও দায়ী। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে প্রায়শই অতিমাত্রায় জনসংখ্যাকে বিনাশের কারণ বলে মনে করা হয়। যাই হোক, একজন আমেরিকার নাগরিকের গড়ে সম্পদের ব্যবহার একজন সোমালিয়ার নাগরিকের গড় ব্যবহারের চেয়ে 40 গুণ বেশি। একইভাবে, ভারতের 5 শতাংশ ধনী ব্যক্তিদের 25 শতাংশ গরিবদের তুলনায় সম্পদ উপভোগের জন্য সম্ভবত পরিবেশের অধিক ক্ষতি করছে। এই ধনী ব্যক্তিদের পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণে ন্যূনতম দায়িত্ব নেই। এখন প্রশ্ন হল, কে, কতটুকু, কোথা থেকে এবং কীভাবে উপভোগ করছে ?

তোমরা জান কি ?

তোমরা জান কি যে, ভারতের অর্ধেকের বেশি প্রাকৃতিক বন ধ্বংস হয়ে গেছে ? এক-তৃতীয়াংশ জলাভূমি শুকিয়ে গেছে, জলাশয়ের 70 শতাংশ দূষিত হয়ে গেছে এবং ম্যানগ্রোভ অরণ্যের 40 শতাংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনবরত বন্যপ্রাণীর শিকার এবং বন্যপ্রাণীর ব্যবসা, বাণিজ্যিক ভাবে মূল্যবান বৃক্ষের কর্তনের কারণে হাজার হাজার উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি লুপ্ত হওয়ার পথে।

কাজ

তোমরা কি এমন কোনো কাজ লক্ষ করেছ যার ফলে তোমাদের আশপাশের জৈববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে ? এ ব্যাপারে একটি টিকা লেখো এবং এর রক্ষার্থে কিছু উপায় বলো।

বন ও বন্যপ্রাণী ধ্বংস শুধুমাত্র জীববিজ্ঞানের কোনো বিষয় নয়। জৈবসম্পদের বিনাশ নিবিড়ভাবে সংস্কৃতিক বিনাশের সাথে জড়িত। এইরূপ বিনাশের কারণে বহু জনজাতি এবং অন্যান্য অরণ্য নির্ভর জাতিসমূহ যারা খাদ্য, পানীয়, ঔষধ, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক প্রভৃতির জন্য বন ও বন্যপ্রাণী থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন দ্রব্যের ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল তারা আর্থিকরূপে দুর্বলতর হচ্ছে এবং দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। গরিব সমুদায়ের মধ্যে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় অধিক প্রভাবিত হয়। অনেক সমাজে, জ্বালানি, পশুখাদ্য, জল এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় বস্তু সংগ্রহ করার দায়িত্ব মহিলাদের ওপর বর্তায়। যখনই এসব সম্পদ কমে যেতে থাকে, মহিলাদের ওপর উচ্ছবৃত্তি (drudgery) অর্থাৎ হীন জীবিকার জন্য চাপ বেড়ে যায় এবং কখনো-কখনো এইসব সম্পদ সংগ্রহের জন্য 10 কিলোমিটারের অধিক পথ পায়ে হেঁটে যেতে হয়। এই কারণে মহিলাদের গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, কাজের সময় বেড়ে যাওয়ায় ঘর ও শিশুদের প্রতি অবজ্ঞা বেড়ে যায়, যার কারণে প্রায়ই মারাত্মক সামাজিক দুষ্পরিণাম দেখা দিতে পারে। বন ধ্বংসের পরোক্ষ পরিণাম যেমন খরা অথবা বন্যা ইত্যাদি গরিব সমুদায়কে সবচেয়ে অধিক প্রভাবিত করে। এইরূপ পরিস্থিতিতে দরিদ্রতা, পরিবেশ ধ্বংসের একটি প্রত্যক্ষ পরিণাম। অতএব, ভারতীয় উপমহাদেশে বন ও বন্যপ্রাণী মানবজীবন ও পরিবেশের জন্য বহুল কল্যাণকারী। এটা অত্যন্ত আবশ্যিক হয়ে পড়েছে যে, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সঠিক নীতি গ্রহণ করা হোক।

ভারতের বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (Conservation of Forest and Wildlife in India)

বন্যপ্রাণীর সংখ্যা ও বন দ্রুতহারে হ্রাস পাওয়ার কারণে তাদের সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা আমাদের প্রয়োজন কেন ? সংরক্ষণের মাধ্যমে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য এবং আমাদের জীবনধারণ পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় জল, বায়ু ও মাটির ভারসাম্য বজায় থাকে। এটি বিভিন্ন প্রজাতির ভালোভাবে বিকাশ ও প্রজননের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর জিনগত বৈচিত্র্যকেও সংরক্ষিত করে। উদাহরণস্বরূপ, কৃষিতে এখনও আমরা বংশানুক্রমিক বিবিধ ফসলের ওপর নির্ভরশীল। মৎস চাষও প্রচণ্ডভাবে জলজ জৈববৈচিত্র্য বজায় থাকার ওপর নির্ভরশীল।

1960 এবং 1970 দশকে সংরক্ষণবাদীরা একটি জাতীয় বন্যপ্রাণী সুরক্ষা কার্যক্রমের জন্য জোর দাবি জানায়। 1972 সালে ভারতীয় বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) অ্যাক্ট কার্যকর হয় যার মধ্যে বন্যপ্রাণীর বাসস্থান সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। সারা ভারতের সংরক্ষিত প্রজাতির একটি তালিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। এই কার্যক্রমের সুবাদে নিশ্চিত বিপন্ন প্রজাতির অবশিষ্ট সংখ্যা রক্ষার্থে শিকার বন্ধ করা হয়েছিল, তাদের বাসস্থানের জন্য আইনানুগ সুরক্ষা দেওয়া হয়েছিল এবং বন্যপ্রাণীর ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার এবং অনেক রাজ্য সরকার জাতীয় উদ্যান এবং বন্য প্রাণীদের জন্য অভয়ারণ্য স্থাপন করেছিল যাদের সম্বন্ধে ইতোমধ্যে তোমরা পড়েছ। কেন্দ্রীয় সরকার গুরুতরভাবে বিপন্ন এমন নির্দিষ্ট প্রাণীদের সংরক্ষণের

চিত্র 2.4 : কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানের গন্ডার ও হরিণ।

জন্য কয়েকটি প্রকল্পও ঘোষণা করেছিল। এই প্রাণীদের মধ্যে বাঘ সহ একশৃঙ্গ গন্ডার, কাশ্মীরি হরিণ অথবা হনগুল (hangul), তিন প্রকার কুমির - স্বাদু জলের কুমির, লবণাক্ত জলের কুমির ও ঘড়িয়াল, এশীয় সিংহ এবং অন্যান্য প্রাণী অন্তর্ভুক্ত। অতি সাম্প্রতিক কালে, ভারতীয় হাতি, কৃষ্ণ হরিণ (Chinkara), বৃহৎ ভারতীয় গোডাবন (Bustered) এবং তুষার চিতা ইত্যাদি পশুদের সারা ভারত জুড়ে শিকার এবং ব্যবসা সম্পূর্ণ বা আংশিক নিষিদ্ধ করে আইনানুগ সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে।

ব্যাঘ্র প্রকল্প (Project Tiger)

প্রাণীজগতে বাঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্য প্রাণীর প্রজাতি। 1973 সালে আধিকারিকরা উপলব্ধি করেন যে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দেশে বাঘের সংখ্যা আনুমানিক 55,000 থেকে হ্রাস পেয়ে 1,827 এ দাঁড়িয়েছে। ব্যবসার জন্য বাঘ শিকার, তাদের বাসস্থানের সংকোচন, শিকারের মাধ্যমে খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বন্য প্রজাতির সংখ্যা কমে যাওয়া, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ইত্যাদি বাঘের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার মুখ্য কারণ। বাঘ ছালের ব্যবসা এবং ঐতিহ্যবাহী ঔষধ তৈরিতে তাদের হাড়ের ব্যবহারের জন্য বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলোতে বাঘের সংখ্যা অতি সন্নিকটে বিলুপ্ত হওয়ার পথে। অতঃপর ভারত ও নেপাল বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ বাঘের বাঁচার জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। এই দুই দেশ চোরা শিকার এবং বেআইনি ব্যবসায়ীদের ওপর মূলত বিশেষ নজর রেখেছিল।

"ব্যাঘ্র প্রকল্প" বিশ্বের বহুল প্রচারিত বন্যজীব পরিকল্পনার মধ্যে একটি এবং 1973 সালে এর সূচনা হয়েছিল। শুরুতে এর একটা সফলতা লক্ষ করা গেছে যার ফলে বাঘের সংখ্যা বেড়ে 1985 সালে 4,002টি এবং 1989 সালে 4,334 টি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 1993 সালে আবার বাঘের সংখ্যা কমে 3600-এ দাঁড়ায়। ভারতে 32137.14 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে 39টি বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্র আছে। বাঘ সংরক্ষণ শুধুমাত্র বিপন্ন প্রজাতিদের বাঁচানোর জন্য চেষ্টা নয়, বরং বেশ বড়ো আকারের জীবজাতিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বাঁচানোও এর উদ্দেশ্য। উত্তরাখণ্ডের করবেট জাতীয় উদ্যান, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান, মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান, রাজস্থানের সরিস্কা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, আসামের মানস বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্র এবং কেরালার পেরিয়ার বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্র হল ভারতের কয়েকটি বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্রের উদাহরণ।

আজকাল সংরক্ষণ প্রকল্পগুলো জৈববৈচিত্র্যের উপাদানের কিছু অংশের ওপর না হয়ে সম্পূর্ণ জৈববৈচিত্র্যের ওপর কেন্দ্রীভূত। সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিতে এখন আরও গভীর অনুসন্ধান করা হচ্ছে। ব্যাপকভাবে, সংরক্ষণ পরিকল্পনায় এমনকি কীট পতঙ্গাদের স্থানও খোঁজা শুরু হয়েছে। 1980 এবং 1986 সালের বন্যপ্রাণী অ্যাক্টের আওতাধীন সুরক্ষিত প্রজাতির তালিকায় কয়েকশো প্রজাপতি, মথ, গোবরে পোকা এবং একটি গঙ্গাফড়িং (Dragonfly) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 1991 সালে উদ্ভিদের 6টি প্রজাতি প্রথমবার এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে।

কাজ

ভারতের জাতীয় উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করো এবং ভারতের মানচিত্রে তাদের অবস্থান চিহ্নিত করো।

উৎস : ****National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment and Forests, Government of India, 2009–10***

তোমরা কি উপরে উল্লিখিত সমস্যাগুলোর কারণ খুঁজে বের করতে পারো ?

বন ও বন্যপ্রাণী সম্পদের প্রকার এবং বণ্টন (Types and Distribution of Forest and Wildlife Resources)

যদি আমরা আমাদের বিশাল বনভূমি ও বন্যপ্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ করতে চাই, তাহলে তাদের পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয়সাধন করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। ভারতে অধিকতর বন ও বন্যপ্রাণী সম্পদ হয় প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীনে অথবা বন বিভাগ বা অন্য বিভাগের মাধ্যমে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই বনগুলোকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

i) সংরক্ষিত বন (Reserved Forest) :
দেশের মোট বনভূমির অর্ধেকের চেয়ে বেশি অংশকে সংরক্ষিত বন ঘোষণা করা হয়েছে। বন ও বন্যপ্রাণী সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত বনভূমিকে সর্বাধিক মূল্যবান মানা হয়।

ii) সুরক্ষিত বন (Protected Forest) :
বন বিভাগ দেশের মোট বনাঞ্চলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বনভূমিকে সুরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করেছে। এই বনভূমিকে আরও অবনমনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সুরক্ষা প্রদান করা হয়।

iii) শ্রেণিহীন বন (Unclassed Forest) :
অন্য সকল প্রকার বনভূমি এবং পতিত ভূমি যা সরকার, ব্যক্তিবর্গ এবং জাতি সমুদায়ের অধীনে রয়েছে, তাদের শ্রেণিহীন বন বলা হয়।

সংরক্ষিত এবং সুরক্ষিত বন এমনই স্থায়ী বনাঞ্চলকে বোঝানো হয় যা গৃহনির্মাণের কাঠ ও অন্য বনজ দ্রব্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এবং তাদের রক্ষা করার জন্য প্রতিপালন করা হয়। মধ্যপ্রদেশে স্থায়ী বনভূমির অন্তর্গত সর্বাধিক অঞ্চল রয়েছে যা এই রাজ্যের মোট বনাঞ্চলের শতকরা 75 ভাগ। জম্মু ও কাশ্মীর, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, কেরালা, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রে মোট বনাঞ্চলের এক বিশাল অংশ সংরক্ষিত বনভূমির অন্তর্গত। অপরদিকে বিহার, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, ওড়িশা এবং রাজস্থানের মোট বনাঞ্চল সুরক্ষিত বনভূমির অধীনে এক বড়ো অংশ রয়েছে। পূর্বোত্তরের সকল রাজ্য এবং গুজরাটের কিছু অংশ অধিকাংশ বনভূমি শ্রেণিহীন বন হিসাবে রয়েছে যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণাধীন।

সম্প্রদায় ও সংরক্ষণ (Community and Conservation)

বন সংরক্ষণ নীতিসমূহ আমাদের দেশে নতুন কিছু নয়। আমরা প্রায়শই অগ্রাহ্য করি যে বন দেশের কতিপয় জনজাতি সমুদায়েরও বাসস্থান। ভারতের কিছু অঞ্চলে স্থানীয় সম্প্রদায় সরকারি আধিকারিকদের সাথে মিলে নিজেদের বাসস্থান সংরক্ষণের জন্য সংগ্রাম করছে। কেননা একমাত্র এর মাধ্যমে সুদীর্ঘকাল ধরে তাদের জীবিকা সুনিশ্চিত হবে। সরিস্কা বাঘ সংরক্ষণে রাজস্থানের গ্রামবাসীরা বন্যপ্রাণী সুরক্ষা অ্যাক্ট অনুযায়ী ওই অঞ্চলের খনন কার্য বন্ধ করার জন্য সংঘর্ষ করছে। অনেক অঞ্চলে গ্রামবাসী নিজেরাই বন্যপ্রাণীর বাসস্থান রক্ষা করছে এবং সরকারি হস্তক্ষেপ স্পষ্টভাবে অস্বীকার করছে। রাজস্থানের আলওয়ারা জেলার পাঁচটি গ্রামের অধিবাসীরা 1,200 হেক্টর বনভূমি ভৈরোদেব ডাকব 'সোনচুরি' হিসাবে ঘোষণা করে যেখানে তাদের নিজস্ব নিয়ম কানুন চলে। সেখানে তারা শিকার নিষিদ্ধ করে এবং যে-কোনো বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করে বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করে।

পবিত্র বনের কুঞ্জ-বিবিধ ও দুর্লভ প্রজাতির সম্পত্তি (Sacred groves - a wealth of diverse and rare species)

প্রকৃতির পূজা বহু পুরোনো জনজাতিদের বিশ্বাস, যার আধার প্রকৃতির সকল সৃষ্টিকে রক্ষা করতে হবে। এরূপ বিশ্বাস বিবিধ বনের আদি এবং বিশুদ্ধ রূপকে বাঁচিয়ে রেখেছে যাকে পবিত্র বনের কুঞ্জ (দেবদেবীদের বন) বলে। বনের এই টুকরো অংশে কিংবা বনের বিশাল অংশকে স্থানীয় লোকরা অক্ষত রাখে এবং অন্যদেরকেও কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতে দেয় না।

কতিপয় সমাজ একটি বিশেষ গাছকে শ্রদ্ধা করত এবং স্মরণাতীত কাল থেকে তাদের রক্ষা করছিল। ছোটোনাগপুর অঞ্চলের মুন্ডা, সাঁওতালরা মহুয়া (Bassia) ও কদম্ব (Anthocaphalus) গাছকে পূজা করে। ওড়িশা ও বিহারের জনজাতিরা বিবাহের সময় তেঁতুল (Tamarindus) ও আম (Mangifera indica) গাছকে পূজা করে। আমাদের অনেকেই পীপল ও বট গাছকে পবিত্র মনে করে।

ভারতীয় সমাজ বিভিন্ন সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত এবং প্রত্যেক সংস্কৃতিতে প্রকৃতি এবং তার সৃষ্টিকে সংরক্ষণ করার নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি রয়েছে। সাধারণত ঝরনা, পর্বতশৃঙ্গা, বৃক্ষ ও পশুকে পবিত্র মনে করে তাদের নিবিড়ভাবে সুরক্ষিত করা হয়। তোমরা অনেক মন্দিরের চারপাশে বানর ও লেঙুড়দের দল পাবে। উপাসকরা প্রতিদিন তাদের খাবার খাওয়ায় এবং মন্দিরের ভক্তদের অংশ হিসাবে গণ্য করে। রাজস্থানের বিশনোই গ্রামে এবং আশেপাশে কৃষ্ণ হরিণ, নীলগাই, চিঙ্কারা এবং ময়ূরের পাল দেখতে পাবে যা ওখানকার সম্প্রদায়ের এক অভিন্ন অংশ এবং কেউই তাদের ক্ষতি করে না।

কাজ

তোমাদের চারপাশে পালন করা হয় এবং তোমাদের দৈনন্দিন জীবনেও অনুশীলন করা হয় যা পরিবেশ রক্ষায় এবং সংরক্ষণে সাহায্য করে এমন যে-কোনো প্রথার ওপর তোমরা একটি ছোটো রচনা লেখো।

হিমালয়ের বিখ্যাত 'চিপকো আন্দোলন' শুধুমাত্র কিছু অঞ্চলের বন ধ্বংস প্রতিহত করার সফলতাই নয়, এটি আরও দেখিয়েছে যে স্বদেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতি ব্যবহার করে সামগ্রিক বনানীকরণ কর্মসূচিকে সাংঘাতিকভাবে সফল করা যেতে পারে। ঐতিহ্যগত সংরক্ষণ পদ্ধতির পুনর্জীবিত করার চেষ্টা অথবা বাস্তুতান্ত্রিক কৃষির নতুন পদ্ধতির বিকাশ আজ বহু বিস্তৃত। তেহরিতে কৃষকদের 'বীজ বাঁচাও আন্দোলন' এবং 'নবদান্য' দেখিয়েছে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ছাড়াই পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন সম্ভব এবং অর্থনৈতিকভাবে বেঁচে থাকাও সম্ভব।

ভারতে যৌথ বন পরিচালনা (JFM) কার্যক্রম ক্ষয়িষ্ণু বনের পুনঃস্থাপন ও পরিচালনায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের যোগদানের উদ্দেশ্যে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ সরবরাহ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে 1988 সালে এই কার্যক্রমের সূচনা হয় যখন ওড়িশা রাজ্যে যৌথ বন পরিচালনার প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয়। বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে "যৌথ বন পরিচালনা" ক্ষয়িষ্ণু বনভূমিকে সুরক্ষিত করার কাজ করে। এই কর্মসূচিতে কাজ করার জন্য গ্রামীণ স্তরে স্থানীয় সংস্থা গঠন করা হয় এবং গ্রামীণ এই সংস্থা ও বন বিভাগের আধিকারিক যৌথভাবে কর্মসূচিটি সম্পাদন করে। বিনিময়ে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা মাঝারি লাভ পায় যেমন কাষ্ঠ নয় এমন বনজ দ্রব্য সংগ্রহের অধিকারী হয় এবং 'সফল সুরক্ষা' এর মাধ্যমে প্রাপ্ত কাঠ লাভের অংশীদার হয়।

ভারতে পরিবেশের বিনাশ ও পুনঃস্থাপন উভয়ের গতিশীল ক্রিয়াকলাপ থেকে স্পষ্ট শিক্ষা পাওয়া যায় যে, স্থানীয় সম্প্রদায়কে সব জায়গায় বেশ কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিন্তু স্থানীয় সম্প্রদায়কে সিদ্ধান্তগ্রহণের মুখ্য ভূমিকায় আনতে এখনও অনেক দীর্ঘ পথ যেতে হবে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র এমন অর্থনৈতিক অথবা উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকলাপ করা প্রয়োজন যা জনগণের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়, পরিবেশ বান্ধব হয় এবং আর্থিকভাবে ফলপ্রসূ হয়।

"গাছ অসীম দয়ালু ও বদান্যতার এক বিশেষ জীব যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোনো চাহিদা করে না এবং নিজের জীবনের ক্রিয়াকর্মের সবকিছু উদারভাবে বিলিয়ে দেয়। গাছ সকল জীবকে রক্ষা করে এবং যে কাঠুরিয়া গাছ কেটে ফেলে তাকেও ছায়া প্রদান করে।"

গৌতম বুদ্ধ (487 খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

অনুশীলনী অনুশীলনী অনুশীলনী অনুশীলনী অনুশীলনী

1. **সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :**

i) নীচের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোন্‌টি উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুল হ্রাসের সঠিক কারণ নয় ?

a) কৃষির প্রসার　　b) বিশাল আকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প

c) পশুচারণ ও জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ　　d) দ্রুত উদ্যোগীকরণ ও নগরায়ন

ii) নীচের সংরক্ষণ নীতির মধ্যে কোন্‌টি সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের সাথে সরাসরি জড়িত নয় ?

a) যৌথ বন পরিচালনা　　b) বীজ বাঁচাও আন্দোলন

c) চিপকো আন্দোলন　　d) বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের সীমানা নির্ধারণ

2. **নীচের প্রাণীগুলোকে তাদের অস্তিত্বের শ্রেণিবিভাগের সাথে জোড়া মেলাও :**

প্রাণী	অস্তিত্বের শ্রেণিবিভাগ
কৃষ্ণ হরিণ	বিলুপ্ত
এশীয় হাতি	দুর্লভ
আন্দামানের বন্য শূকর	বিপন্ন
হিমালয়ের খয়েরি ভালুক	দুর্বল
গোলাপি মাথাযুক্ত হাঁস	স্থানীয়

3. **নিম্নলিখিত ছকটির বামপক্ষের সাথে ডানপক্ষকে মেলাও :**

সংরক্ষিত বন	সরকার, ব্যক্তি ও সম্প্রদায় উভয়ের অধীন অন্যান্য বন এবং পতিত ভূমি।
সুরক্ষিত বন	বন সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে বনকে সর্বাধিক মূল্যবান মানা হয়।
শ্রেণিহীন বন	বনভূমি যাকে আরও অধিক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়।

4. **নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :**

i) জৈববৈচিত্র্য কী ? মানব জীবনে জৈববৈচিত্র্য কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

ii) কীভাবে মানুষের ক্রিয়াকলাপে উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুলের হ্রাসে প্রভাব ফেলে ? ব্যাখ্যা করো।

5. **নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 120 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :**

i) কীভাবে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় বন ও বন্যপ্রাণীকে সংরক্ষণ ও সুরক্ষিত করছে ? বর্ণনা করো।

ii) বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে উপযুক্ত রীতিনীতির ওপর একটি টিকা লেখো।

জল সম্পদ

WATER RESOURCES 3

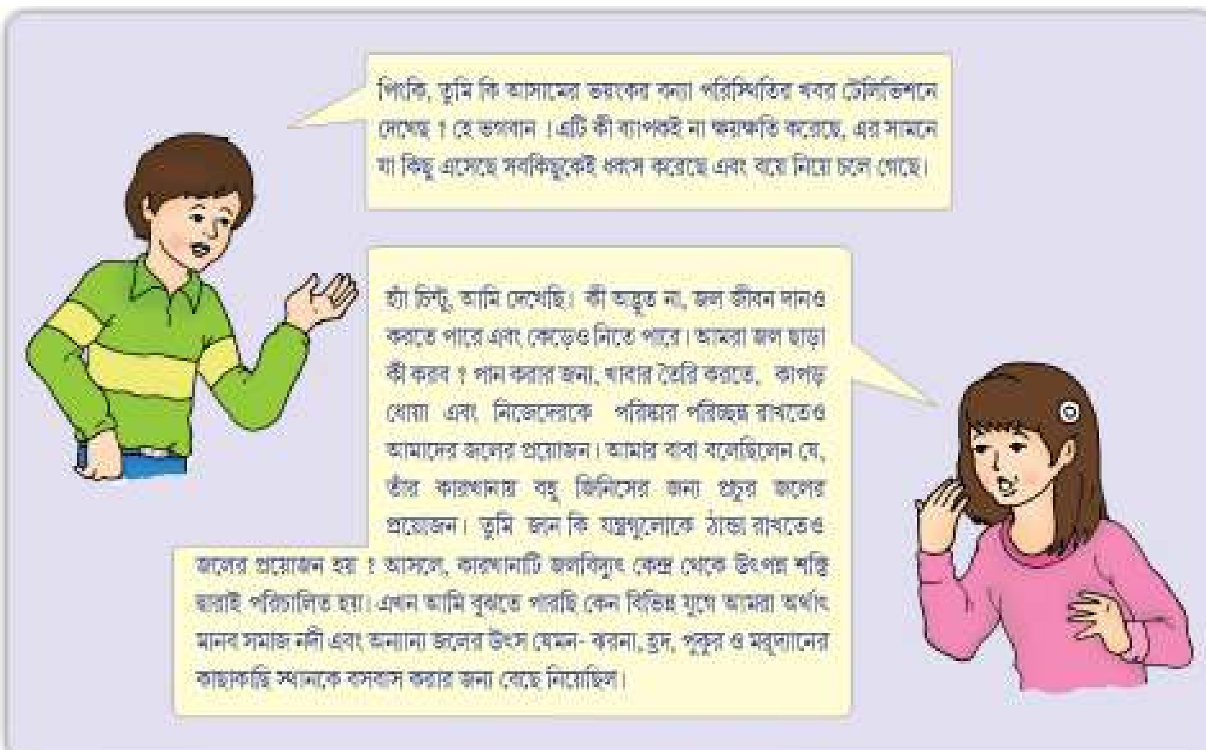

তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের তিন-চতুর্থাংশ জল দ্বারা আবৃত, কিন্তু এর যৎসামান্য ভাগই স্বাদুজলের অন্তর্গত, যা ব্যবহার করা যেতে পারে। এই স্বাদুজল প্রধানত ভূপৃষ্ঠ প্রবাহ এবং ভৌমজল থেকে পাওয়া যায়, যা জলচক্রের মাধ্যমে ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি এবং পুনরুজ্জীবিত (Recharge) হয়। সকল প্রকার জল, জলচক্রের মাধ্যমে আবর্তিত হয় যা নবীকরণযোগ্য সম্পদরূপে জলের ব্যবহার সুনিশ্চিত করে।

তোমাদের নিশ্চয়ই এখন ভাবতে অবাক লাগছে যে, পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ জল দ্বারা আবৃত এবং জল নবীকরণযোগ্য সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের বহু দেশ এবং অঞ্চলে কীভাবে জলের এত অভাব হয় ? কেন এরকম ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে যে, 2025 সালে প্রায় 2 বিলিয়ন লোক জলের চরম অভাব অনুভব করবে ?

জল : কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যান

- অনুমান করা হয় যে, বিশ্বের মোট পরিমাণ জলের 96.5 শতাংশ মহাসাগর রূপে বিদ্যমান এবং মাত্র 2.5 শতাংশ স্বাদুজলের অন্তর্গত। এই স্বাদুজলের প্রায় 70 শতাংশ অ্যান্টার্কটিকা, গ্রিনল্যান্ড এবং বিশ্বের পার্বত্য অঞ্চলে মহাদেশীয় হিমবাহ ও অন্যান্য হিমবাহ রূপে বর্তমান, যেখানে 30 শতাংশের কম বিশ্বের অ্যাকুইফারগুলোতে (Aquifers) ভৌমজল রূপে সঞ্চিত।
- বিশ্বব্যাপী অধঃক্ষেপণের প্রায় 4 শতাংশ ভারতে ঘটে থাকে এবং বছরে জনপ্রতি জল প্রাপ্তির দিক থেকে ভারত বিশ্বে 133তম স্থান দখল করে আছে।
- ভারতের মোট নবীকরণযোগ্য জলসম্পদের পরিমাণ আনুমানিক প্রতি বছরে 1,897 বর্গকিমি।

➲ পূর্বানুমান করা হচ্ছে যে, ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল 2025 সালের মধ্যে জলের চরম অভাবযুক্ত দেশ অথবা অঞ্চলগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।
উৎস : *The UN World Water Development Report, 2003*

জল সংকট এবং জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবস্থাপনা (Water Scarcity and the Need for Water Conservation and Management)

জলের প্রাচুর্যতা এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য গুণ থাকা সত্ত্বেও এটি অনুমান করা দুরূহ যে, আমরা জল সংকটে ভোগতে পারি। যখনই আমরা জলের অভাবের কথা ভাবি তখনই কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অথবা খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলোর কথা আমাদের মাথায় আসে। আমাদের চোখের সামনে তৎক্ষণাৎ রাজস্থানের মরুভূমি ও মহিলাদের চিত্র ভেসে ওঠে যাঁরা জল সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের জন্য ব্যবহৃত 'মটকা (মাটির কলশ)' মাথার উপর একের পর এক সাজিয়ে নিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত যাতায়াত করে। এটি সত্য যে, প্রধানত বার্ষিক অধঃক্ষেপণ এবং ঋতুগত বিভিন্নতার কারণে স্থান ও কাল ভেদে জলের প্রাপ্যতায় বিভিন্নতা আসে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলের অভাবের মূল কারণ হচ্ছে অতিমাত্রায় শোষণ, অত্যধিক ব্যবহার এবং সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে জলের অসম বণ্টন।

সবত্রই জল আর জল, কিন্তু পান করার জন্য এক বিন্দুও নেই : প্রবল বর্ষণের পর কলকাতায় একটি ছেলে পানীয় জল সংগ্রহ করছে। সারারাতব্যাপী 180 মিলিমিটার বৃষ্টি হওয়ার দরুন বিশাল এলাকা প্লাবিত এবং যান চলাচল ব্যাহত হওয়ার ফলে শহর ও সংলগ্ন জেলাগুলোতে জীবন অচল হয়ে পড়েছে।

एक ओर इज़राइल जैसे 25 सेमी. औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है तो दूसरी ओर 114 सेमी. औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रति वर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जलप्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी–नालों में तेज़ी से बहकर समुद्र में चला जाता है जिससे वर्षा के बाद के लगभग नौ महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। ये ही मूल कारण हैं देश में जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं।

ভূমিকম্পের পর বেঁচে থাকা একজন কাশ্মীরি মহিলা একটি বিধ্বস্ত গ্রামে বরফের উপর দিয়ে জল বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

চিত্র 3.1 : পানীয় জলের সংকট

সুইডিশ বিশেষজ্ঞ ফকেনমার্কের মতে, যখন জলের প্রাপ্যতা বছরে জনপ্রতি 1000-1600 কিউবিক মিটার হয় তখন জলের অভাব অনুভূত হয়।

তাহলে জলের আকাল সম্ভবত কোথায় হতে পারে ? তোমরা জলচক্রে পড়েছ স্বাদুজল প্রত্যক্ষভাবে বৃষ্টিপাত, ভূপৃষ্ঠ প্রবাহ এবং ভৌমজল থেকে পাওয়া যেতে পারে।

এটা কি সম্ভব একটি অঞ্চলে জলসম্পদের প্রাচুর্যতা থাকা সত্ত্বেও ওই অঞ্চলটি জল সংকটের সম্মুখীন হতে পারে ? আমাদের বহু শহর এরই উদাহরণ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, জলের অনবরত চাহিদা বৃদ্ধি এবং জলের অসম বণ্টনের কারণে জল সংকট তীব্র আকার ধারণ করছে। বিশাল জনসংখ্যার গৃহস্থালির কাজের জন্যই শুধুমাত্র অধিক জলের প্রয়োজন নয়, অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্যও প্রয়োজন হয়। এ কারণে, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য জলসম্পদের অত্যধিক ব্যবহার করেই জলসেচ অঞ্চলের বিস্তার করা হয়, যাতে করে শুষ্ক ঋতুতেও কৃষিকাজ করা যেতে পারে। জলসেচ ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি জলের ব্যবহার হয়। খরাসহনশীল শস্য উৎপাদন এবং শুষ্ক কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে কৃষিকার্যে আমূল পরিবর্তন আনা এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তোমরা টেলিভিশনের বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে হয়তো বা দেখেছ যে, বহু কৃষকের কৃষিজমিতে নিজস্ব কূপ এবং নলকূপ আছে, যার দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা করে তারা তাদের শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করছে। কিন্তু তোমরা কখনও ভেবেছ এর পরিণাম কী হবে ? এর কারণে ভৌম জলস্তর হ্রাস পেতে পারে, জলের প্রাপ্যতায় এবং মানুষের জন্য খাদ্য সুরক্ষায় বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

স্বাধীনোত্তর ভারত ব্যাপক শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের সাক্ষ্য বহন করার ফলে আমাদের অনেক সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানকালে সর্বত্র বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান (MNC) বড়ো বড়ো শিল্পজাত কোম্পানির হয়ে কাজ করছে। শিল্পের অত্যধিক উন্নয়নের ফলে স্বাদুজল সম্পদের ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অত্যধিক জল ছাড়াও শিল্পগুলোকে চালানোর জন্য শক্তিরও প্রয়োজন হয়। এই শক্তির অধিকাংশই আসে জলবিদ্যুৎ শক্তি থেকে। বর্তমানে ভারতে মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তির প্রায় 22 শতাংশ জলবিদ্যুৎ থেকে প্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু, শহরের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং জনঘনত্ব তথা শহরের জীবনযাত্রার কারণে শুধুমাত্র জল ও শক্তির প্রয়োজনীয়তাই বৃদ্ধি পায়নি সে সম্পর্কিত সমস্যাগুলোকে আরও গুরুতর করছে। যদি তোমরা শহরগুলোর আবাস সমিতি (Housing Society) বা কলোনিতে লক্ষ কর তাহলে দেখতে পাবে যে, এদের মধ্যে বেশিরভাগ আবাস সমিতিতেই ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনকারী যন্ত্র রয়েছে যা তাদের জলের চাহিদা পূরণ করে। এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, আমরা দেখি যে, হ্রাসপ্রাপ্ত জলসম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে এসকল শহরে জলের হ্রাস ঘটছে।

এ পর্যন্ত আমরা জলসংকটের পরিমাণগত দিকের ওপরই দৃষ্টিপাত করেছি। এখন চলো আমরা আরেকটি পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখি, যেখানে জনসাধারণের চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এলাকাটি তবুও জলসংকটে ভুগছে। এই সংকট জলের নিম্নমানের কারণে হতে পারে। সাম্প্রতিককালে এটি একটি ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, জনগণের চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত জল থাকা সত্ত্বেও গৃহস্থালির এবং শিল্পজাত বর্জ্যপদার্থ, রাসায়নিক, কীটনাশক এবং কৃষিতে ব্যবহৃত সার দ্বারা এর বেশিরভাগই দূষিত হতে পারে, যার ফলে এটি মানুষের ব্যবহারের জন্য বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে।

ভারতের নদী বিশেষ করে ছোটো ছোটো নদীগুলো সব বিষাক্ত জলস্রোতে পরিণত হয়েছে। এমনকি বড়ো নদীগুলো যেমন গঙ্গা এবং যমুনাও বিশুদ্ধ নয়। ভারতের নদীগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষির আধুনিকীকরণ, নগরায়ণ, শিল্পায়ন প্রভৃতির অত্যধিক কুপ্রভাব পড়ছে এবং দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে .... যার ফলে সমস্ত জীবকুলই সংকটের সম্মুখীন।

উৎস : The Citizens' Fifth Report, CSE, 1999

তোমরা হয়তো বা ইতোমধ্যে বুঝতে পারছ যে, বর্তমান সময়ের প্রয়োজনীয়তা হল আমাদের জলসম্পদের সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা। নিজেদেরকে স্বাস্থ্য বিপত্তি থেকে রক্ষা করা, খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা, আমাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় ও উৎপাদনশীল ক্রিয়াকলাপসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করা। জলসম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার ও অব্যবস্থাপনা এই সম্পদকে নিঃশেষ করে দেবে এবং বাস্তুতন্ত্রের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে যা আমাদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

কাজ

তোমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে জল সংরক্ষণের বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব লেখো।

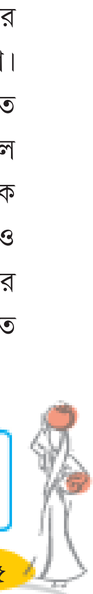

বহুমুখী নদী পরিকল্পনা এবং সমন্বিত জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা (Multi-Purpose River Projects and Integrated Water Resources Management)

কিন্তু, কীভাবে আমরা জল সংরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারি ? প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রাচীনকাল থেকেই জলসেচের জন্য আধুনিক জলবাহী পরিকাঠামো যেমন- প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নির্মিত বাঁধ, জলাধার বা হ্রদ, নদীতে বাঁধ এবং খাল নির্মাণ করা হয়েছে। এটি কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, অধিকাংশ নদী অববাহিকায় বাঁধ তৈরি করার এই ধারাটি আধুনিক ভারতে এখনও বজায় রয়েছে।

প্রাচীন ভারতের জলবাহী পরিকাঠামোসমূহ (Hydraulic Structures in Ancient India)

- খ্রিস্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এলাহাবাদের কাছাকাছি শ্রীঙ্গাবেরাপুরাতে গঙ্গা নদীর বন্যার জল সরবরাহকারী অত্যাধুনিক জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছিল।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে বাঁধ, হ্রদ ও সেচব্যবস্থা ব্যাপকভাবে নির্মিত হয়েছিল।
- কলিঙ্গ (ওড়িশা), নাগার্জুনকোন্ডা (অন্ধ্রপ্রদেশ), বেন্নুর (কর্ণাটক), কোলাপুর (মহারাষ্ট্র) ইত্যাদি স্থানে অত্যাধুনিক সেচপ্রকল্পের প্রমাণ পাওয়া যায়।
- একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত কৃত্রিম হ্রদগুলোর মধ্যে ভোপাল হ্রদ একটি বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ।
- সিরি দুর্গ এলাকায় জল সরবরাহের জন্য চতুর্দশ শতাব্দীতে ইলতুৎমিস দিল্লির হোজ খাসে জলাশয় নির্মাণ করেছিলেন।

উৎস : *Dying Wisdom, CSE, 1997*

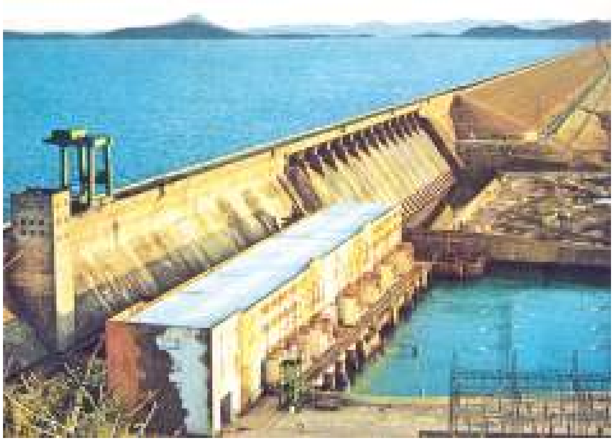

চিত্র 3.2 : হীরাকুঁদ বাঁধ

বাঁধ কী এবং এগুলো জল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আমাদের কীভাবে সাহায্য করে ? ঐতিহ্যগতভাবে নদী এবং বৃষ্টির জল অবরুদ্ধ করে বাঁধগুলো নির্মাণ করা হত যাতে পরবর্তী সময়ে কৃষি জমিগুলোতে জলসেচের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমানে বাঁধ কেবলমাত্র জলসেচের জন্য তৈরি করা হয় না। এর পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদন, ঘরোয়া ও শিল্পকর্মে জলের সরবরাহ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিনোদন, অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল এবং মৎস্য প্রজননের জন্যও নির্মাণ করা হয়। অতএব, বাঁধগুলোকে এখন বহুমুখী প্রকল্প হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, যেখানে আবদ্ধ জলের বিভিন্ন ব্যবহার একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, শতদ্রু-বিপাশা নদী অববাহিকায় ভাকরা নাঙ্গাল প্রকল্পের জল জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচ উভয় কাজে ব্যবহৃত হয়। একইভাবে, মহানদী অববাহিকার হীরাকুঁদ প্রকল্প জল সংরক্ষণ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ উভয় কাজকেই সাধিত করে।

বাঁধ হল একটি প্রতিবন্ধকতা যা জল প্রবাহকে বাঁধা দেয়, দিক নিয়ন্ত্রণ করে বা আটকে রাখে, যা প্রায়ই জলাধার, হ্রদ বা আবদ্ধ জলাশয় তৈরি করে। 'বাঁধ' বলতে কাঠামোর পরিবর্তে জলাধারকে বোঝায়। অধিকাংশ বাঁধগুলোর মধ্যে একটি জল নির্গমনের পথ (Spillway) বা 'উইঅ্যার' (Weir) নামে একটি অংশ থাকে যার ওপর দিয়ে বা যার মাধ্যমে জল মাঝেমধ্যে থেমে থেমে বা ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হয়। বাঁধকে কাঠামো, পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অথবা উচ্চতা অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। কাঠামো এবং ব্যবহৃত উপকরণের ওপর ভিত্তি করে বাঁধগুলোকে কাঠের বাঁধ, পাথর বা কংক্রিটের বাঁধ (embankment) হিসাবে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়, যার বিভিন্ন উপবিভাগও রয়েছে। উচ্চতা অনুসারে বাঁধকে বৃহৎ বাঁধ এবং প্রধান বাঁধ বা বিকল্পভাবে নিম্ন বাঁধ, মাঝারি উচ্চতার বাঁধ এবং উচ্চ বাঁধ হিসাবে শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে।

স্বাধীনতা লাভের পর যেসব সমন্বিত জলসম্পদ ব্যবস্থা দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গঠিত বহুমুখী পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল সেগুলো ঔপনিবেশিক সময়কালীন বাধাসমূহ দূর করে দেশকে উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবার মাধ্যম রূপে পরিচালিত হয়। জওহরলাল নেহেরু গর্বের সাথে বাঁধগুলোকে 'আধুনিক ভারতের মন্দির' বলতেন, কেননা তিনি মনে করতেন যে, এগুলো দ্রুত শিল্পায়ন এবং শহরের অর্থনীতির উন্নতির সাথে সাথে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থব্যবস্থাকেও উন্নত করবে।

কাজ

বাঁধ নির্মাণ ও সেচ কার্যের যে-কোনো একটি গতানুগতিক পদ্ধতি সম্পর্কে আরও তথ্য খুঁজে বের করো।

আমরা আষাঢ় মাসে বীজ বপন করেছি
ভাদ্র মাসে আমরা ভাদু নিয়ে আসব
বন্যা দামোদরকে স্ফীত করে দিয়েছে
নৌকা এখানে বইতে পারবে না
ওহ ! দামোদর, আমরা তোমার পায়ে পড়ি
বন্যার জলকে একটু কমিয়ে দাও
ভাদু এক বছর পর আসবে
তোমার জলে নৌকাকে বইতে দাও।

(দামোদর উপত্যকা অঞ্চলের এই জনপ্রিয় 'ভাদু' গানটি দামোদর নদ যা দুঃখের নদী হিসাবে পরিচিত, সেই নদীতে বন্যার সময়ে মানুষের সমস্যার কথা বর্ণনা করে।)

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, বহুমুখী প্রকল্প এবং বিশাল বাঁধগুলো বিভিন্ন কারণে ব্যাপকভাবে গভীর তদন্ত ও বিরোধীতার সন্মুখীন হয়েছে। নদীগুলোর ওপর বাঁধ নির্মাণ ও তাদের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার ফলে এদের স্বাভাবিক প্রবাহ প্রভাবিত হয়, যার কারণে পলল প্রবাহ কম হয় এবং জলাধারের তলদেশে অত্যধিক পলি সঞ্চিত হয়। এর ফলে নদীর তলদেশ প্রস্তরময় হয়ে নদীর জলজ জীবনের আবাসস্থল হ্রাস পায়। বাঁধ নদীকে ছোটো ছোটো খণ্ডে বিভক্ত করে দেয় যার ফলে জলজ প্রাণীদের নদীতে বিশেষ করে ডিম দেওয়ার সময় ফিরে আসতে বাধা সৃষ্টি করে। প্লাবন ভূমিতে নির্মিত জলাধারগুলো ওই স্থানের উদ্ভিদ এবং মৃত্তিকাকে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের পর বিয়োজিত করে সম্পূর্ণরূপে জলে নিমজ্জিত করে ফেলে।

বহুমুখী প্রকল্প এবং বিশাল বিশাল বাঁধ বহু নতুন পরিবেশগত আন্দোলন যেমন- 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' এবং 'তেহরি বাঁধ আন্দোলন' এর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রকল্পগুলোর বিরোধ প্রধানত স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহের বৃহৎ আকারের বাস্তুচ্যুতির কারণে হয়েছে। স্থানীয় জনগণকে প্রায়শই তাদের জমি, জীবিকা এবং সম্পদের প্রতি ভালোবাসা ও নিয়ন্ত্রণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ছেড়ে দিতে হয়। অতএব, যদি স্থানীয় মানুষ এই ধরনের প্রকল্প থেকে উপকৃত না হয় তাহলে কে উপকৃত হবে ? সম্ভবত জমিদার ও ধনী কৃষক, শিল্পপতি এবং কিছু শহুরে কেন্দ্র। একটি গ্রামে ভূমিহীনদের বিষয়টি নাও - ওরা কি এরূপ প্রকল্প থেকে বাস্তবেই লাভবান হয় ?

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন একটি বেসরকারি সংস্থা (NGO)' যা গুজরাটের নর্মদা নদী জুড়ে নির্মিত সর্দার সরোবর বাঁধের জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ, কৃষক, পরিবেশবিদ এবং মানবাধিকার কার্যক্রমকে সংগঠিত করেছিল। এটি মূলত বাঁধের জলের নীচে ডুবে যাওয়া গাছপালা সম্মন্ধযুক্ত পরিবেশগত বিষয়গুলোর ওপর দৃষ্টিপাত করেছিল। সম্প্রতি এটি দরিদ্র নাগরিক বিশেষ করে বাস্তুচ্যুতদের সক্ষম করার লক্ষ্যে সরকারের কাছ থেকে পূর্ণ পুনর্বাসন সুবিধা পেতে পুনরায় দৃষ্টিপাত করেছে।

মানুষ আশা করেছিল যে, তাদের দুঃখ বৃথা যাবে না ...... বাস্তুচ্যুত হওয়ার দুঃখ তারা স্বীকার করেছে এই প্রতিশ্রুতিতে যে, জলসেচের সুবিধা পাওয়া যাবে এবং প্রচুর ফসল উৎপাদিত হবে। তাই প্রায়শই রিহান্দেরবেঁচে থাকা ব্যক্তিরা আমাদের বলে যে, দেশের জন্য বলিদান হিসাবে তারা কষ্ট ভোগ করছে। কিন্তু এখন, তিক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ত্রিশ বছর ধরে নিরাপত্তাহীন থাকার পর তাদের জীবিকা আরও অনিশ্চিত হয়ে গেছে, তাই তাদের জিজ্ঞাসা : "রাষ্ট্রের জন্য বলিদান করতে কি শুধুমাত্র আমাদেরকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল ?"

উৎস : *S. Sharma, quoted in In the Belly of the River. Tribal conflicts over development in Narmada valley, A. Baviskar, 1995.*

তোমরা জান কি ?

গুজরাটের নর্মদা নদীর ওপর সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মিত হয়েছে। এটি ভারতের বিশাল জলসম্পদ প্রকল্পসমূহের মধ্যে অন্যতম, যেখানে চারটি রাজ্য যথা- মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট এবং রাজস্থান অন্তর্ভুক্ত। সর্দার সরোবর প্রকল্পটি গুজরাট (9,490টি গ্রাম এবং 173টি শহর) এবং রাজস্থান (124টি গ্রাম) এর খরাপ্রবণ এবং মরু অঞ্চলের জলের প্রযোজনীয়তাকে মেটাবে।

উৎস : *http://www.sardarsarovardam.org/project.aspx*

সেচব্যবস্থা বহু অঞ্চলের শস্য উৎপাদনের ধরনও পরিবর্তন করেছে, যা কৃষকদের নিবিড় কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে পরিবর্তিত করেছে। এর ফলে মৃত্তিকায় লবণাক্ততার মতো গুরুতর পরিবেশগত পরিণতি দেখা দিতে পারে। একই সময়ে, এটি ধনী জমির মালিক

ভারত : প্রধান নদনদী ও বাঁধসমূহ

এবং ভূমিহীন গরিবদের মধ্যেকার সামাজিক দূরত্বকে বৃদ্ধি করে সামাজিক চিত্রকে পরিবর্তিত করে দিচ্ছে। যেমন আমরা দেখতে পাই যে, বাঁধ একই জলসম্পদের বিভিন্ন ব্যবহার এবং সুবিধা পাওয়া মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছিল। গুজরাটে সবরমতী অববাহিকায় বিশেষ করে খরার সময় জল সরবরাহে শহরাঞ্চলকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায় কৃষকরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং প্রায় দাঙ্গার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল, বহুমুখী প্রকল্পের অর্থব্যয় এবং প্রাপ্য লাভের ভাগ নিয়েও আন্তঃরাজ্য জলবিবাদ এখন খুব সাধারণ বিষয় হয়ে পড়েছে।

তোমরা জান কি ?

তোমরা জান কি যে, কৃষ্ণা-গোদাবরী বিতর্ক, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের আপত্তি জানানোর কারণে শুরু হয়েছিল ? বহুমুখী প্রকল্পের উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্রে সরকার কর্তৃক কয়না-তে গতিপথ পরিবর্তন করে অধিক জল সরবরাহের কারণে এর সূত্রপাত ঘটে। এর ফলে তাদের রাজ্যগুলোতে নদীর নিম্নপ্রবাহ হ্রাস পাবে এবং কৃষি ও শিল্পে বিপরীত প্রভাব পড়বে।

আন্তঃরাজ্য জল বিবাদের একটি তালিকা তৈরি করো।

যে উদ্দেশ্যে বাঁধসমূহ নির্মাণ করা হয়েছিল, তার ব্যর্থতার জন্য অধিকাংশ নদী প্রকল্পগুলোর ওপর আপত্তি উঠেছিল। এটা খুবই কৌতুকপূর্ণ ব্যাপার যে, বাঁধগুলোকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু জলাধারগুলোতেই পলি সঞ্চয়ের ফলে এগুলো বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু অত্যধিক বৃষ্টিপাতের সময় অধিকাংশ বড়ো বাঁধগুলোই বন্যা নিয়ন্ত্রণে অসফল হয়। তোমরা হয়তো বা দেখেছ বা পড়ে থাকবে যে, 2006 সালে মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে ভারী বৃষ্টিপাতের সময় বাঁধসমূহ থেকে বিশাল পরিমাণ জল ছাড়ার ফলে বন্যা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে পড়েছিল। বন্যা শুধুমাত্র জীবন ও সম্পত্তিই ক্ষতি করে না, বরং ব্যাপক মৃত্তিকা ক্ষয়ও সাধন করে। পলিসঞ্চয় বলতে আরও বোঝায় যে, প্লাবিত ভূমিগুলো পলি থেকে বঞ্চিত থাকে, যা একটি প্রাকৃতিক সার রূপে কাজ করে। যার কারণে ভূমির অবনমন বৃদ্ধি পায়। এছাড়া আরও দেখা গেছে যে, বহুমুখী প্রকল্পের দরুন ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং অত্যধিক জলের ব্যবহারের ফলে জলবাহিত রোগ, ফসলে কীটপতঙ্গ জনিত রোগ এবং দূষণ ঘটে।

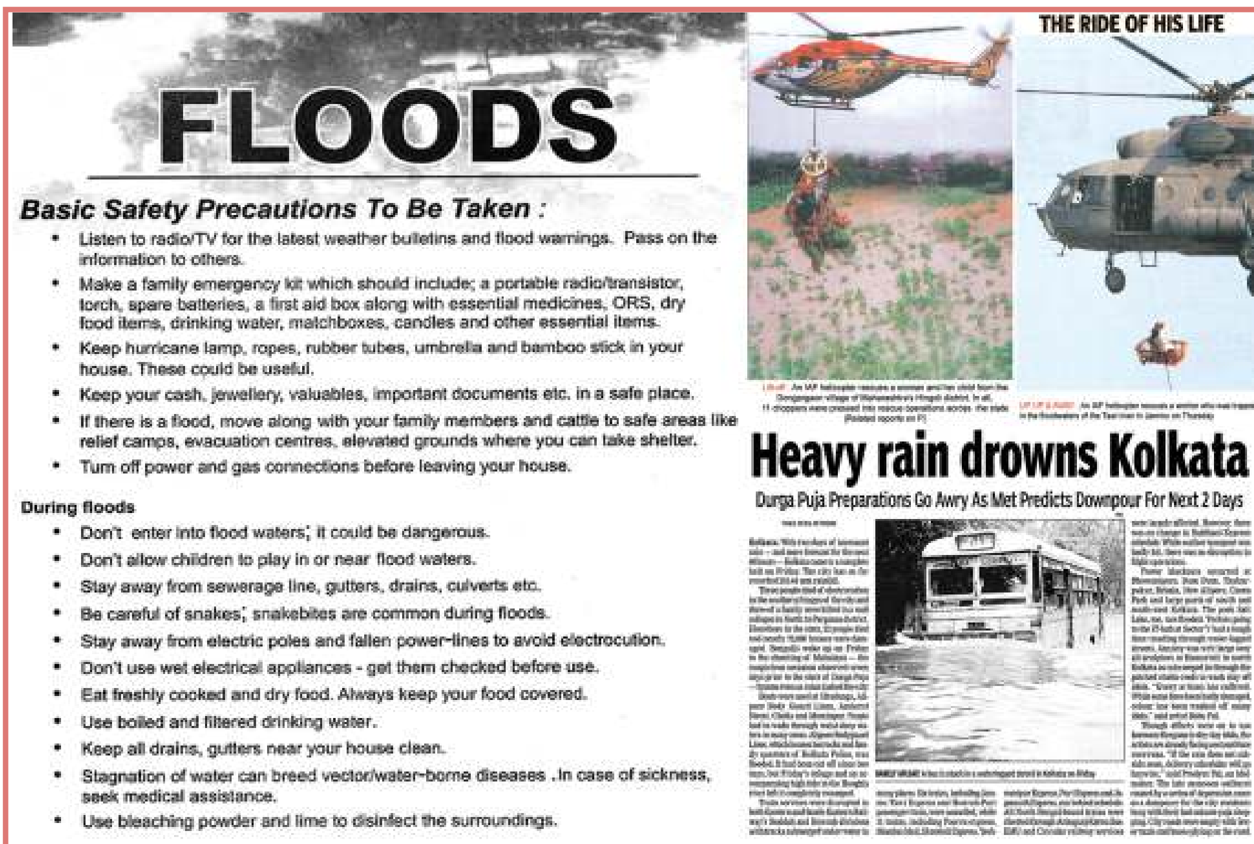
FLOODS

Basic Safety Precautions To Be Taken :

- Listen to radio/TV for the latest weather bulletins and flood warnings. Pass on the information to others.
- Make a family emergency kit which should include; a portable radio/transistor, torch, spare batteries, a first aid box along with essential medicines, ORS, dry food items, drinking water, matchboxes, candles and other essential items.
- Keep hurricane lamp, ropes, rubber tubes, umbrella and bamboo stick in your house. These could be useful.
- Keep your cash, jewellery, valuables, important documents etc. in a safe place.
- If there is a flood, move along with your family members and cattle to safe areas like relief camps, evacuation centres, elevated grounds where you can take shelter.
- Turn off power and gas connections before leaving your house.

During floods

- Don't enter into flood waters; it could be dangerous.
- Don't allow children to play in or near flood waters.
- Stay away from sewerage line, gutters, drains, culverts etc.
- Be careful of snakes; snakebites are common during floods.
- Stay away from electric poles and fallen power-lines to avoid electrocution.
- Don't use wet electrical appliances - get them checked before use.
- Eat freshly cooked and dry food. Always keep your food covered.
- Use boiled and filtered drinking water.
- Keep all drains, gutters near your house clean.
- Stagnation of water can breed vector/water-borne diseases .In case of sickness, seek medical assistance.
- Use bleaching powder and lime to disinfect the surroundings.

THE RIDE OF HIS LIFE

Heavy rain drowns Kolkata

Durga Puja Preparations Go Awry As Met Predicts Downpour For Next 2 Days

দেশের বন্যা কবলিত অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ (Rainwater Harvesting)

অনেকেই মনে করেন যে, বহুমুখী প্রকল্পগুলোর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কিছু অসুবিধা এবং উত্থাপিত বিরোধিতার কারণে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত উভয় দিক থেকেই এক স্থায়ী বিকল্প পদ্ধতি ছিল। প্রাচীন ভারতে, উন্নত জলবাহী কাঠামোর পাশাপাশি জল সংরক্ষণেরও এক লক্ষণীয় (regemes) ধারা বিদ্যমান ছিল। সেই সময়কার জনগণের বৃষ্টিপাতের ঋতুপর্যায় এবং মৃত্তিকার প্রকারভেদ সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান ছিল। স্থানীয় বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থা এবং জলের প্রয়োজনীয়তা বজায় রেখে ওরা বৃষ্টির জল, ভৌমজল, নদীর জল এবং বন্যার জল সংরক্ষণের ব্যাপক প্রসারিত কৌশল সম্প্রসারিত করেছিল। পাহাড় এবং পার্বত্য অঞ্চলে মানুষ পশ্চিম হিমালয়ে 'গুল' (Guls) ও 'কুল' (Kuls) এর মতো গতিপথ পরিবর্তনকারী খাল তৈরি করেছে, যাতে করে কৃষিকার্যে জলসেচের সুবিধা পাওয়া যায়। রাজস্থানে পানীয় জল সঞ্চয় করে রাখার জন্য 'বাড়ির ছাদে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ' (Roof top Rainwater Harvesting) পদ্ধতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। বাংলায় প্লাবনভূমিতে লোকেরা কৃষিজমিতে জলসেচের জন্য প্লাবন খাল তৈরি করত। শুষ্ক এবং প্রায় শুষ্ক অঞ্চলে কৃষি জমিগুলোকে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের পরিকাঠামো রূপে পরিবর্তিত করা হত যা বৃষ্টির জলকে এক জায়গায় ধরে রাখত এবং মৃত্তিকাকে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করত। এটি রাজস্থানের শহর জয়সলমির-এ 'খাদিন' (Khadins) এবং রাজস্থানের অন্যান্য অঞ্চলে 'জোহার' (Johads) নামে পরিচিত।

চিত্র 3.3

(a) নলকূপের মাধ্যমে পুনরায় জলপূর্ণ করা

(b) পরিত্যক্ত কূপের মাধ্যমে পুনরায় জলপূর্ণ করা

চিত্র 3.4 : বাড়ির ছাদে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ

- PVC পাইপ ব্যবহার করে বাড়ির ছাদের বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা হয়।
- বালি এবং ইট দ্বারা জল পরিশ্রুত করা হয়।
- ভূগর্ভস্থ পাইপ দ্বারা জল গর্ত পর্যন্ত যায়, সেখান থেকে একে তাৎক্ষণিক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- গর্ত থেকে অতিরিক্ত জল কূপ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়।
- কূপের জল ভৌমজলকে পুনরুজ্জীবিত করে।
- পরবর্তী সময়ে কূপ থেকে জল তোলা হয়।

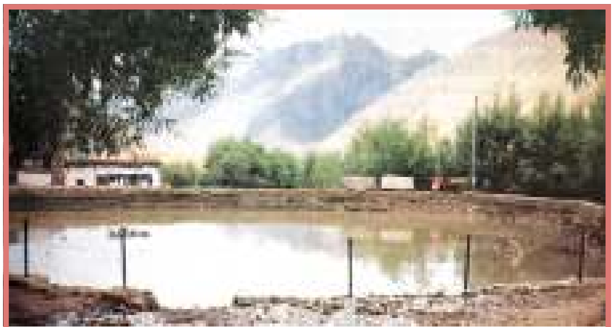

কাজাগ্রামের উপরের চিত্র অনুযায়ী, একটি কুল থেকে গোলাকার গ্রামীণ ট্যাংক তৈরি করা হয়, যেখান থেকে প্রয়োজন অনুসারে জল ছাড়া হয়।

চিত্র 3.5 : বৃষ্টির জল সংরক্ষণের চিরাচরিত পদ্ধতি

রাজস্থানের শুষ্ক এবং প্রায় শুষ্ক অঞ্চলে, বিশেষ করে বিকানির, ফলোদি এবং বারমের-এ প্রায় সব বাড়িতেই পানীয় জল সংরক্ষণের জন্য ভূগর্ভস্থ ট্যাংক বা 'টাঙ্কা' থাকত। এদের আকার বড়ো বড়ো কক্ষের মতো হত; ফলোদির এক বাড়িতে 6.1 মিটার গভীর, 4.27 মিটার লম্বা এবং 2.44 মিটার চওড়া ট্যাংক ছিল। টাঙ্কা এখানে সুবিকশিত বাড়ির ছাদের বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভিন্ন অংশ ছিল যা মূল ঘর বা উঠোনে বানানো হত। এগুলো ঘরের ঢালু ছাদের সাথে পাইপ দ্বারা যুক্ত থাকত। ছাদ থেকে বৃষ্টির জল এই নলের মাধ্যমে ভূ-অভ্যন্তরস্থ টাঙ্কায় পৌঁছাত, যেখানে একে সংগ্রহ করা হত। প্রথমবারের বৃষ্টির জল ছাদ এবং নলগুলোকে পরিষ্কার করতে ব্যবহার করা হত এবং একে সংগ্রহ করা হত না। এর পরের বারের বৃষ্টিপাতের জল সংগ্রহ করা হত।

টাঙ্কায় বৃষ্টির জল আগামী বর্ষা ঋতু পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এটি একটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পানীয় জলের উৎস হয়ে দাঁড়ায়, যখন জলের সমস্ত উৎস শুকিয়ে যায়, বিশেষ করে গ্রীষ্ম ঋতুতে। বৃষ্টির জল যা সাধারণত এই অঞ্চলে **'পালর পানী'** নামে পরিচিত, প্রাকৃতিক জলের শুদ্ধতম রূপ হিসাবে বিবেচিত। অনেক বাড়িতে টাঙ্কর সাথে ভূগর্ভস্থ কক্ষও বানানো হয়, কারণ জলের এই উৎস এই কক্ষগুলোকে ঠান্ডা রাখে, যা গরমকালে প্রচণ্ড গরম থেকে রেহাই প্রদান করে।

মজাদার তথ্য

মেঘালয়ের শিলং-এ বাড়ির ছাদে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ বহুল প্রচলিত। এটা মজাদার এইজন্য যে, চেরাপুঞ্জী এবং মৌসিনরাম যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে অধিক বৃষ্টিপাত হয় তা শিলং থেকে 55 কিমি দূরত্বে অবস্থিত। তথাপি এই রাজ্যের রাজধানী শিলং জলের স্বল্পতাযুক্ত গভীর সমস্যার সন্মুখীন। শহরটির প্রায় সব বাড়ির ছাদেই বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। গৃহস্থালির কাজের জন্য যতটুকু জল প্রয়োজন তার মোট পরিমাণের প্রায় শতকরা 15-25 ভাগ বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা থেকে আসে।

কাজ

তোমাদের এলাকায় বিদ্যমান অন্যান্য বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের করো।

এটা দুঃখজনক ব্যাপার যে, বর্তমানকালে পশ্চিম রাজস্থানে বাড়ির ছাদের বৃষ্টির জল সংরক্ষণ পদ্ধতি হ্রাস পাচ্ছে, কারণ ইন্দিরা গান্ধি ক্যানেল থেকে সারাবছর প্রচুর পরিমাণে জল সরবরাহ করা হয়। যদিও কিছু কিছু বাড়িতে টাঙ্কার সুবিধা এখনও বর্তমান আছে, কারণ তাদের নলের জলের স্বাদ পছন্দ নয়। সৌভাগ্যক্রমে আজও ভারতের অনেক গ্রামীণ এবং শহুরে এলাকায় বাড়ির ছাদের জল সংরক্ষণ ও সংগ্রহের এই উপায় সফলভাবে গ্রহণ করা হয়। কর্ণাটকের মহীশূর জেলায় অবস্থিত এক সুদূর অনগ্রসর গ্রাম গেন্ডাথুরে গ্রামবাসীরা নিজ নিজ বাড়িতে জলের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য বাড়ির ছাদের বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। গ্রামের প্রায় 200 টি বাড়িতে এই ব্যবস্থা আছে এবং এই গ্রামটি বৃষ্টির জলসম্পন্ন গ্রাম নামে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। বাড়ির ছাদের

বাড়ির ছাদের বৃষ্টির জল সংরক্ষণ থর-এর সকল শহর এবং গ্রামে প্রচলিত ছিল। বৃষ্টির জল বাড়ির ঢালু ছাদে পড়ে পাইপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ টাঙ্কায় (ভূমিতে গোল গর্ত) সংগ্রহ করা হয়, যা মুখ্য বসত বাড়ি বা উঠোনে বানানো হয়। উপরের চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিবেশীর ছাদ থেকে জল একটি লম্বা পাইপ দ্বারা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখানে প্রতিবেশীর ছাদ বৃষ্টির জল সংগ্রহ করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। চিত্রে একটি গর্ত দেখানো হয়েছে যার দ্বারা বৃষ্টির জল ভূগর্ভস্থ টাঙ্কায় চলে যায়।

চিত্র 3.6

বাঁশের মাধ্যমে জলসেচ ব্যবস্থা
(Bamboo Drip Irrigation System)

মেঘালয়ে বাঁশ নির্মিত নল ব্যবহার করে ছোটো নদী ও ঝরনার জলকে সংগ্রহ করার 200 বছরের পুরানো পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। বাঁশের নলের মধ্য দিয়ে প্রবিষ্ট প্রায় 18-20 লিটার জল কয়েক'শ মিটার এর অধিক দূরত্বে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অবশেষে জলের প্রবাহ কমিয়ে প্রতি মিনিটে 20-80 ফোঁটা জল যেখানে উদ্ভিদ রয়েছে সেখানে দেওয়া হয়।

চিত্র 1 : পাহাড়ের উপরের নিত্যবহ ঝরনাগুলোর দিক পরিবর্তনের জন্য বাঁশের নল ব্যবহার করা হয়, যাতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নিম্নাঞ্চলে জল পৌঁছানো যায়।

চিত্র 2 এবং 3 : বাঁশের নির্মিত নলপথের মাধ্যমে উদ্ভিদ ক্ষেত্রের দিকে জলের প্রবাহের দিক পরিবর্তন করানো হয়, যেখানে বিভিন্ন ধরনের বাঁশের নলগুলোকে পুনরায় ক্রম পর্যায়ে সাজিয়ে বিভিন্ন শাখায় এই জলকে বণ্টন করা হয়। নলের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে নলের মাধ্যমে প্রবাহিত জলকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

চিত্র 4 : যদি পাইপগুলোকে রাস্তার ওপারে নিয়ে যেতে হয় তখন এদের ভূমির অনেক ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

চিত্র 5 এবং 6 : জল ব্যবহারের শেষ পর্যায়ে কমিয়ে আনা নলপথ ও দিক-পরিবর্তক ক্ষেত্রগুলোকে ব্যবহার করা হয়। নলপথের শেষ ভাগটি উদ্ভিদের মূলের কাছাকাছি ফোঁটা ফোঁটা জল দিতে সক্ষম হয়।

চিত্র 3.7

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝার জন্য চিত্র 3.6 দেখো, যা এখানে অনুসরণ করা হয়েছে। গেন্ডাথুর গ্রামে 1,000 মিমি বার্ষিক বৃষ্টিপাত হয় এবং সংগ্রহ ক্ষমতার 80 শতাংশের মধ্যে প্রায় 10 শতাংশ পরিপূর্ণ হয়, যার থেকে প্রতিটি বাড়ি প্রতি বছর 50,000 লিটার জল সংগ্রহ এবং ব্যবহার করতে পারে। 200টি বাড়ি থেকে প্রতি বছর প্রায় 1,00,000 লিটার জল সংরক্ষণ করা হয়।

মজাদার তথ্য

তামিলনাড়ু হল ভারতের প্রথম রাজ্য যেখানে প্রতিটি বাড়িতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ কাঠামো তৈরি করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। খেলাপকারীদের আইনত শাস্তি দেবার বিধান রয়েছে।

কাজ

1. শিল্পসমূহ কীভাবে আমদের জল সম্পদকে দূষিত করছে, এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।
2. তোমার সহপাঠীদের সঙ্গে মিলিতভাবে নিজের এলাকায় জলবিবাদের ওপর একটি নাটক মঞ্চস্ত করো।

অনুশীলনী অনুশীলনী অনুশীলনী অনুশীলনী অনুশীলনী

1) সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :

i) নিম্নলিখিত তথ্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে পরিস্থিতিসমূহকে 'জল সংকট দ্বারা প্রভাবিত' অথবা 'জল সংকট দ্বারা অপ্রভাবিত' শ্রেণিতে বিভক্ত করো।

a) অধিক বার্ষিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল।

b) অধিক বার্ষিক বৃষ্টিপাত এবং অধিক জনসংখ্যাযুক্ত অঞ্চল।

c) অধিক বার্ষিক বৃষ্টিপাত কিন্তু অত্যধিক দূষিত জলযুক্ত অঞ্চল।

d) কম বৃষ্টিপাত এবং কম জনসংখ্যাযুক্ত অঞ্চল।

ii) নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোন্‌টি বহুমুখী নদী পরিকল্পনার স্বপক্ষে দেওয়া যুক্তি নয় ?

a) বহুমুখী নদী পরিকল্পনাসমূহ ওই সকল অঞ্চলে জল নিয়ে আসে যেখানে জলের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

b) বহুমুখী নদী পরিকল্পনাসমূহ জলের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

c) বহুমুখী নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বৃহৎ মাত্রায় স্থানচ্যুতি ঘটে এবং বহুলোক জীবিকা হারায়।

d) বহুমুখী নদী পরিকল্পনাসমূহ আমাদের শিল্প এবং বাড়িঘরের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

iii) এখানে কিছু অশুদ্ধ বিবৃতি রয়েছে। অশুদ্ধ বিবৃতিগুলোকে চিহ্নিত করো এবং শুদ্ধভাবে পুনরায় লেখো।

a) শহরের কেন্দ্রগুলোর ক্রমাগত বৃদ্ধি, জনসংখ্যাধিক্য এবং জনঘনত্ব তথা শহরের জীবনধারা জলসম্পদের সঠিক ব্যবহারে সাহায্য করেছে।

b) নদীগুলোতে বাঁধ নির্মাণ করা এবং এদের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ তথা পলি প্রবাহ প্রভাবিত হয় না।

c) গুজরাটে সবরমতী অববাহিকায় খরার সময়ে শহরাঞ্চলে জল সরবরাহে প্রাধান্য দেওয়ায় কৃষকরা উত্তেজিত হয়নি।

d) বর্তমানকালে রাজস্থানে ইন্দিরা গান্ধি ক্যানেল থেকে পানীয় জল পাওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টির জল সংরক্ষণের রীতি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

2) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

i) জল কীভাবে পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ - ব্যাখ্যা করো।

ii) জল সংকট কী এবং এর প্রধান কারণগুলো কী কী ?

iii) বহুমুখী নদী পরিকল্পনার সুফল এবং কুফল এর তুলনামূলক আলোচনা করো।

3) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 120 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

i) রাজস্থানের প্রায় শুষ্ক অঞ্চলে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ কীভাবে করা হয়? আলোচনা করো।

ii) বৃষ্টির জল সংরক্ষণের চিরাচরিত পদ্ধতিগুলোর আধুনিক সংস্কার করে কীভাবে জল সংরক্ষণ এবং সঞ্চয় করা হচ্ছে তা বর্ণনা করো।

কৃষি
AGRICULTURE 4

কৃষির দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। দেশের দুই-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা কৃষিকার্যে নিযুক্ত। কৃষি একটি প্রাথমিক কাজ যা আমাদের জন্য বেশিরভাগ খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করে। খাদ্যশস্য ছাড়াও এটি বিভিন্ন শিল্প কারখানার জন্য কাঁচামাল উৎপন্ন করে।

কৃষিভিত্তিক কাঁচামালের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এমন কিছু শিল্প উদ্যোগের নাম তোমরা বলতে পারো কি ?

উপরন্তু, কিছু কৃষিজ পণ্য যেমন চা, কফি, মশলা প্রভৃতিও রপ্তানি করা হয়।

কৃষির প্রকার ভেদ (Type of Farming)

কৃষি আমাদের দেশের একটি প্রাচীন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। বিগত বছরগুলোতে প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ, প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক জ্ঞান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের ওপর ভিত্তি করে কৃষি পদ্ধতিতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। জীবিকানির্বাহ থেকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্র পর্যন্ত কৃষি বিভিন্ন প্রকারের হয়। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নিম্নলিখিত কৃষি পদ্ধতিগুলো প্রচলিত আছে।

আদিম জীবিকাভিত্তিক কৃষি (Primitive Subsistence Farming)

এ ধরনের কৃষি ভারতের কিছু অংশে আজও প্রচলিত আছে। প্রারম্ভিক জীবিকাভিত্তিক কৃষি ছোটো ছোটো টুকরো জমির উপর আদিম কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন খুরপি, দা ও খননে সহায়ক লাঠির সাহায্যে এবং পরিবার অথবা সম্প্রদায়ের শ্রমের বিনিময়ে করা হয়। এ ধরনের কৃষি মৌসুমি বৃষ্টিপাত, মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা এবং ফসল উৎপাদনের অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার পর্যাপ্ততার ওপর নির্ভর করে।

এটি একটি 'কর্তন ও দহন (Slash and burn)' পদ্ধতির কৃষি। কৃষক এক টুকরো জমি পরিষ্কার করে তাতে পরিবারের জীবিকানির্বাহ করার জন্য দানাশস্য ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে। যখন মাটির উর্বরতা কমে যায়, কৃষকরা ওই স্থান পরিবর্তন করে এবং চাষের জন্য নতুন করে অন্য একটি টুকরো জমি পরিষ্কার করে। কৃষির এ ধরনের স্থানান্তরের ফলে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাটির উর্বরতা পুনরায় বৃদ্ধি পায়। যেহেতু কৃষক সার কিংবা অন্য কোনো আধুনিক কৃষি উপাদান ব্যবহার করে না, তাই এ ধরনের কৃষিতে উৎপাদন কম হয়। দেশের বিভিন্ন ভাগে এ ধরনের কৃষি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

তোমরা এ ধরনের কৃষির কয়েকটি নাম বলতে পারো কি ?

এ ধরনের কৃষি উত্তর-পূর্ব রাজ্য আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও নাগাল্যান্ডে 'জুমচাষ' নামে পরিচিত। মণিপুরে 'পামলু', ছত্তিশগড়ের বাস্তার জেলায় এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এটিকে 'দীপা' বলে।

জুমচাষ (Jhumming) : 'কর্তন ও দহন' কৃষি পদ্ধতি মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকায় 'মিল্পা', ভেনেজুয়েলায় 'কোনুকো', ব্রাজিলে 'রোকা', মধ্য আফ্রিকায় 'মসোলে', ইন্দোনেশিয়ায় 'লদাংগ' এবং ভিয়েতনামে 'রে' নামে পরিচিত।

ভারতে এই আদিম কৃষি পদ্ধতিকে মধ্যপ্রদেশে 'বেবর' অথবা 'দহিয়া', অন্ধ্রপ্রদেশে 'পোদু' অথবা 'পেন্ডা', ওড়িশায় 'পামা দাবি' অথবা 'কোমান' অথবা 'বরিংগা', পশ্চিমঘাটে 'কুমারী', দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানে 'ভালরে' অথবা 'ভল্টরে', হিমালয় অঞ্চলে 'খিল', ঝাড়খণ্ডে 'কুরুয়া' এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে 'জুম' বলা হয়।

চিত্র 4.1

আসামের দিফুর সীমান্তে একটি ছোটো গ্রামে রিনঝা তার পরিবারের সাথে বাস করত। সে তার পরিবারের সদস্যদের চাষের জন্য এক টুকরো জমিতে পরিষ্কার, কর্তন ও দহনের কাজ করতে দেখে আনন্দ পেত। প্রায়শই সে পরিবারের সদস্যদের সাথে গিয়ে পাশের ঝরনা থেকে বাঁশের নলে করে জল এনে কৃষি জমিতে জলসেচের কাজে তাদের সাহায্য করত। সে তার চারপাশের পরিবেশকে ভালোবাসে এবং যতটা সম্ভব সেখানেই থাকতে চায়। কিন্তু মাটির উর্বরতা কমে যাওয়ার ব্যাপারে মেয়েটির কোনো ধারণা ছিল না। সে এটাও জানত না যে, পরবর্তী মরশুমে তার পরিবারের সদস্যরা চাষের জন্য নতুন এক টুকরো জমির খোঁজ করবে।

তোমরা কি রিনঝার পরিবার যে ধরনের কৃষিকাজের সাথে যুক্ত আছে তার নাম বলতে পারো ?

তোমরা কি এ ধরনের কৃষিতে উৎপন্ন কিছু ফসলের নাম তালিকাভুক্ত করতে পারো ?

নিবিড় জীবিকাভিত্তিক কৃষি
(Intensive Subsistence Farming)

যেখানে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বেশি, সেখানে এই ধরনের কাজ করা হয়। এটি নিবিড় শ্রমযুক্ত কৃষি যেখানে অধিকতর ফলন পাওয়ার জন্য জৈবরাসায়নিক উপাদান এবং জলসেচ অধিকমাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

তোমরা কি ভারতের কয়েকটি রাজ্যের নাম বলতে পারো যেখানে এ ধরনের কৃষিকাজ করা হয় ?

যদিও 'উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার' এর কারণে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে জমি বণ্টনের ফলে জমির আকার ছোটো এবং অলাভজনক হতে থাকে, তথাপি আয়ের বিকল্প পথ না থাকায় কৃষকরা জীবনধারণের জন্য সীমিত জমিতে অধিকতম ফসল পেতে অনবরত চেষ্টা করে। এভাবে কৃষিজমির উপর খুব চাপ পড়ে।

বাণিজ্যিক কৃষি (Commercial Farming)

এ ধরনের কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অধিকতর ফলনের জন্য অধিকমাত্রায় আধুনিক উপাদান, যথা- উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রভৃতির ব্যবহার। কৃষির বাণিজ্যিককরণের স্তর অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে ধান বাণিজ্যিক শস্য, কিন্তু ওড়িশায় এটি একটি জীবিকাভিত্তিক শস্য।

তোমরা কি এমন আরও কয়েকটি শস্যের উদাহরণ দিতে পারো যেগুলো একটি অঞ্চলে বাণিজ্যিক ফসল এবং অন্য অঞ্চলে জীবিকাভিত্তিক ফসল হতে পারে ?

বাগিচা কৃষিও এক প্রকার বাণিজ্যিক কৃষি। এ ধরনের কৃষিতে একটি বিশাল জমিতে একটি ফসলই ফলানো হয়। কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে বাগিচা কৃষির একটি আন্তঃসম্পর্ক (Interface) রয়েছে। এরূপ কৃষি ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে যেখানে অত্যধিক মূলধন ব্যবহৃত হয় এবং বহিরাগত শ্রমিকের সহায়তা নেওয়া হয়, সেখানেই করা হয়। উৎপাদিত সমস্ত ফসল নির্দিষ্ট শিল্প কারখানাগুলোতে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র 4.2 : ভারতের দক্ষিণ ভাগের কলা বাগান

চিত্র 4.3 : উত্তর-পূর্বের বাঁশ বাগান

ভারতের বাগিচা কৃষিজাত ফসলগুলোর মধ্যে চা, কফি, রবার, আখ, কলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ। আসামে ও উত্তরবঙ্গে চা, কর্ণাটকের কফি এই রাজ্যগুলোতে উৎপন্ন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাগিচা ফসলের মধ্যে অন্যতম। বাগিচা কৃষিতে প্রধানত বিক্রয়ের জন্য ফসল উৎপন্ন করা হয়। এজন্য বাগিচা কৃষির উন্নতিকল্পে বাগিচা অঞ্চল, প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকারখানা এবং বাজারের সাথে যুক্ত উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শস্য চাষের ধরন (Cropping Pattern)

তোমরা ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছ। এটি দেশের শস্য চাষের ধরন এবং কৃষি পদ্ধতিতেও প্রভাব ফেলে। দেশের উৎপন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফসলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশস্য ও তন্তু ফসল, সবজি ও ফল, মশলা ও আচার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। ভারতে শস্য চাষের তিনটি ঋতু আছে— **রবি, খারিফ এবং জ্যায়েদ** ঋতু।

রবিশস্য শীতকালে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বপন করা হয় এবং গ্রীষ্মকালে এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে ফসল তোলা হয়। রবিশস্যগুলোর মধ্যে গম, বার্লি, মটর, ছোলা এবং সরিষা গুরুত্বপূর্ণ ফসল। যদিও এই ফসলগুলো ভারতের বৃহৎ অংশে উৎপন্ন হয়, তথাপি দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম রাজ্যসমূহ যেমন- পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড ও উত্তরপ্রদেশে গম ও অন্যান্য রবিশস্য উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শীতকালে নাতিশীতোষ্ণ পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে সংগঠিত বৃষ্টিপাত এইরূপ ফসলের অধিক উৎপাদনে সহায়ক হয়। তাছাড়া পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং রাজস্থানের কিছু অংশে সবুজ বিপ্লবের সফলতাও উপরে উল্লিখিত রবিশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির এক উল্লেখযোগ্য প্রভাবক।

খারিফ শস্য দেশের বিভিন্ন অংশে মৌসুমি বৃষ্টিপাতের আগমনের সাথে সাথে বপন করা হয় এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ওই ফসল কাটা হয়। এই ঋতুর উল্লেখযোগ্য ফসল হল ধান, ভূট্টা, জোয়ার, বাজরা, অড়হর, মুগ, উরাদ, তুলা, পাট, বাদাম ও সয়াবিন ইত্যাদি। কয়েকটি ধান উৎপাদক অঞ্চলের মধ্যে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা উপকূল অঞ্চল, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, কেরালা ও মহারাষ্ট্র, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার সহ কোঙ্কন উপকূল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে ধান পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় গুরুত্বপূর্ণ ফসলে পরিণত হয়েছে। প্রতি বছর আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশায় তিন ধরনের ধান উৎপাদিত হয়। এগুলো হল ***আউস, আমন ও বুরো***।

রবি ও খারিফ ফসলের ঋতুর মধ্যবর্তী গ্রীষ্মকালের একটি স্বল্প দৈর্ঘের ঋতু **জ্যায়েদ** নামে পরিচিত। জ্যায়েদ ঋতুতে প্রধানত তরমুজ, খরমুজা, শশা, সবজি এবং পশুখাদ্যের ফসল উৎপন্ন হয়। আখ উৎপাদনে প্রায় এক বছর লেগে যায়।

প্রধান ফসলসমূহ (Major Crops)

মৃত্তিকার বৈচিত্র্য, জলবায়ু এবং চাষ পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে দেশের বিভিন্ন ভাগে নানারকমের খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য ফসল জন্মায়। ভারতে উৎপন্ন হয় এমন ফসলগুলোর মধ্যে ধান, গম, মিলেট, ডাল, চা, কফি, আখ, তৈলবীজ, তুলা, পাট ইত্যাদি প্রধান।

ধান (Rice) :

ধান ভারতের অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্যশস্য। চিনের পর আমাদের দেশ ধান উৎপাদনে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। এটি একটি খারিফ শস্য যা উৎপাদনের জন্য $25^{\circ}c$ এর অধিক উচ্চ তাপমাত্রা এবং 100cm এর অধিক বৃষ্টিপাতসহ উচ্চ আর্দ্রতার প্রয়োজন। স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে জলসেচের সাহায্যে ধান চাষ করা হয়।

ধান উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সমভূমি, উপকূল অঞ্চল এবং ব-দ্বীপ অঞ্চলে জন্মায়। স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে যেমন, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং রাজস্থানের কিছু

চিত্র 4.4 (a) : ধান চাষ

চিত্র 4.4 (b) : ধান খেত থেকে ফসল তোলার জন্য প্রস্তুত।

ভারত
ধান
N
পাকিস্তান
চিন
(তিব্বত)
নেপাল
ভুটান
বাংলাদেশ
মায়ানমার
কর্কটক্রান্তি রেখা
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর
শ্রীলঙ্কা
লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ
(ভারত)
আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
(ভারত)
মুখ্য অঞ্চল
গৌণ অঞ্চল
0 200 400 600 কিমি
68°E 72° 76° 80° 84° 88° 92° 96°E
36°N 32° 28° 24° 20° 16° 12° 8°N
72°E 76° 84° 88° 92°E

ভারত : ধানের বণ্টন

অংশে খালের উন্নত ঘন জাল এবং নলকূপের সাহায্যে জলসেচের মাধ্যমে ধান উৎপাদন সম্ভবপর হয়েছে।

গম (Wheat) : গম দ্বিতীয়তম গুরুত্বপূর্ণ দানাশস্য। দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশে এটি প্রধান খাদ্যশস্য। এই রবিশস্যের উৎপাদনের জন্য শীত ঋতু এবং ফসল পাকার সময় উজ্জ্বল সূর্যালোকের প্রয়োজন। এটি উৎপাদনের জন্য সমভাবে বণ্টিত 50cm থেকে 75cm বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। দেশে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গম উৎপাদক বলয় রয়েছে — উত্তর-পশ্চিমের গঙ্গা-শতদ্রু সমভূমি এবং দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল। দেশের প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চলগুলোর মধ্যে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ উল্লেখযোগ্য।

চিত্র 4.5 : গম চাষ

মিলেট (Millets) : ভারতে উৎপন্ন জোয়ার, বাজরা ও রাগি হল গুরুত্বপূর্ণ মিলেট। এ ফসলগুলো সাধারণ (Coarse) শস্যরূপে পরিচিত হলেও, এদের পুষ্টিগত মূল্য অধিকমাত্রায় রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রাগির মধ্যে খুব বেশি পরিমাণে লোহা, ক্যালশিয়াম, অন্যান্য স্বল্পমাত্রিক পুষ্টি এবং ভুষি থাকে। অঞ্চল ও উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে জোয়ার তৃতীয়তম গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য। এই ফসলটি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল। অধিকতর আর্দ্র অঞ্চলে এই ফসল উৎপাদন করার কারণে ফসল উৎপাদনের জন্য জলসেচের প্রয়োজন হয় না। প্রধান জোয়ার উৎপাদক রাজ্যগুলোর মধ্যে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ উল্লেখযোগ্য।

বাজরা বেলেমাটি এবং অগভীর কৃষ্ণ মৃত্তিকায় ভালো জন্মায়। প্রধান বাজরা উৎপাদক রাজ্যগুলো হল রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং হরিয়ানা। রাগি শুষ্ক অঞ্চলের একটি ফসল

চিত্র 4.6 : বাজরা চাষ

এবং লাল, কালো, বালিময়, দোআঁশ এবং অগভীর কালো মাটিতে ভালো জন্মায়। রাগি উৎপাদক রাজ্যগুলোর মধ্যে কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, সিকিম, ঝাড়খণ্ড এবং অরুণাচল প্রদেশ প্রধান।

ভুট্টা (Maize) : ভুট্টা এমনই একটি ফসল যা খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্য উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি খারিফ ফসল যার উৎপাদনের জন্য 21°c থেকে 27°c এর মধ্যে তাপমাত্রা প্রয়োজন হয়। এটি

চিত্র 4.7 : ভুট্টা চাষ

পুরোনো পলি মাটিতে ভালো জন্মায়। কিছু রাজ্যে যেমন বিহারে রবি ফসলের ঋতুতেও এটি জন্মায়। আধুনিক উপাদান যেমন- উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার এবং জলসেচের ব্যবহার এই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। প্রধান ভুট্টা উৎপাদক রাজ্যগুলোর মধ্যে কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং মধ্যপ্রদেশ উল্লেখযোগ্য।

ডাল (Pulses) : বিশ্বে ভারত ডালের বৃহত্তম উৎপাদক তথা উপভোক্তা দেশ। নিরামিষ খাদ্যে ডাল প্রোটিনের প্রধান উৎস। ভারতে উৎপন্ন প্রধান ডালগুলো হল উরাদ, মুগ, মশুর, মটর এবং ছোলা।

ভারত
গম
পাকিস্তান
চিন
(তিব্বত)
নে পা ল
ভুটান
বাংলাদেশ
মায়ানমার
কর্কটক্রান্তি রেখা
আরব সাগর
ব ঙ্গো প সা গ র
ভা র ত ম হা সা গ র
লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ
(ভারত)
আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
(ভারত)
মুখ্য অঞ্চল
গৌণ অঞ্চল
0 200 400 600 কিমি
68°E 72° 76° 80° 84° 88° 92° 96°E
36°N 32° 28° 24° 20° 16° 12° 8°N

ভারত : গমের বণ্টন

তোমরা কি আলাদা করতে পারবে কোন্ ডালগুলো খারিফ শস্যের ঋতুতে জন্মায় এবং কোন্‌গুলো রবিশস্যের ঋতুতে জন্মায় ? ডাল চাষের জন্য আর্দ্রতার প্রয়োজন। এমনকি শুষ্ক আবহাওয়াতেও এদের চাষ করা যায়। ডাল শিম্বগোত্রীয় ফসল হওয়া সত্ত্বেও, অড়হর ছাড়া সব ডাল বায়ু থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে মাটির উর্বরতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। অতএব, এই ফসলকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্য ফসলের সাথে পর্যায়ক্রমে বপন করা হয়। ভারতের ডাল উৎপাদনকারী রাজ্যগুলোর মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটক অন্যতম।

দানাশস্য ছাড়া অন্যান্য খাদ্য ফসল (Food Crops other than Grains)

ইক্ষু বা আখ (Sugarcane) :

আখ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। এই ফসলটি 21°c থেকে 27°c তাপমাত্রা এবং 75cm থেকে 100cm বার্ষিক

চিত্র 4.8 : ইক্ষু বা আখ চাষ

বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে ভালো জন্মায়। কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে এটি উৎপাদনের জন্য জলসেচের প্রয়োজন। এই ফসল বিভিন্ন মাটিতে ফলানো যায় এবং এর জন্য বপন থেকে শুরু করে ফসল তোলা পর্যন্ত প্রচুর কায়িক শ্রমের প্রয়োজন। ব্রাজিলের পর ভারত আখ উৎপাদনে দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক দেশ। এটি চিনি, গুড়, খান্দেশ্বরি এবং রাব তৈরির প্রধান উৎস। আখ উৎপাদক রাজ্যগুলোর মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, বিহার, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা প্রধান।

তৈলবীজ (Oil Seeds) : 2014 সালে চিনের পর ভারত বাদাম উৎপাদনে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ ছিল। আবার 2014 সালে কানাডা ও চিনের পর ভারত র‍্যাপসিড উৎপাদনে পৃথিবীতে তৃতীয় বৃহত্তম উৎপাদক দেশ ছিল। দেশের মোট শস্য উৎপাদক অঞ্চলের প্রায় শতকরা 12 ভাগ অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। ভারতে উৎপন্ন প্রধান তৈলবীজগুলো হল বাদাম, সরিষা, নারিকেল, তিল, সয়াবিন, রেড়ির বীজ, তুলাবীজ, তিসি এবং সূর্যমুখী ফুলের বীজ ইত্যাদি। এদের বেশিরভাগ ভোজ্যতেল এবং রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। যাই হোক, এদের কয়েকটি আবার সাবান, প্রসাধনী ও মলম উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

বাদাম একটি খারিফ ফসল এবং দেশের প্রধান তৈলবীজগুলোর মোট উৎপাদনের অর্ধেক ভাগ এই ফসল থেকে পাওয়া যায়। 2015-16 সালে গুজরাট বাদাম উৎপাদনে বৃহত্তম রাজ্য ছিল এবং এরপর রাজস্থান ও তামিলনাড়ুর স্থান। তিসি ও সরিষা রবি ফসল। তিল উত্তর ভারতের খারিফ ফসল এবং দক্ষিণ ভারতে রবি ফসল। রেড়ি রবি ও খারিফ উভয় ঋতুতেই জন্মায়।

চা (Tea) : চা চাষ একটি বাগিচা কৃষির উদাহরণ। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ পানীয় ফসল যা প্রাথমিক অবস্থায় ব্রিটিশরা ভারতে সূচনা করেছিল। আজ ভারতীয়রাই বেশিরভাগ চা বাগানগুলোর মালিক। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় জলবায়ুতে হিউমাস ও জৈবপদার্থে পরিপূর্ণ উর্বর মাটি ও উপযুক্ত জলনিকাশি সুবিধাযুক্ত ঢালু জমিতে চা গাছ ভালো জন্মায়। গাছগুলোর (ঝোপগুলোর) জন্য সারা বছর তুষারমুক্ত উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু প্রয়োজন। সারা বছর ধরে সমভাবে বর্ষিত বৃষ্টিপাত চা গাছগুলোতে অবিরাম কোমল পাতা উৎপন্ন হতে সাহায্য করে। চা একটি নিবিড় শ্রমযুক্ত শিল্পোদ্যোগ। এর চাষের জন্য প্রচুর সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। চায়ের সতেজতা বজায় রাখার

চিত্র 4.9 : জমি থেকে বাদাম, সূর্যমুখী ফুল ও সরিষা তোলার জন্য প্রস্তুত

জন্য চা বাগানের মধ্যে এর প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। আসাম, দার্জিলিং পাহাড় ও জলপাইগুড়ি জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং কেরালা চা উৎপাদক রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রধান। এছাড়াও হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মেঘালয়, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ত্রিপুরাও দেশের চা উৎপাদক রাজ্য। 2014 সালে চিনের পর ভারত চা উৎপাদনে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক দেশ ছিল।

চিত্র 4.10 : চা চাষ

চিত্র 4.11 : চা পাতা তোলার কাজ

কফি (Coffee) : 2014 সালে বিশ্বের কফি উৎপাদনের শতকরা 3.5 ভাগ কফি ভারত উৎপাদন করেছিল। উন্নত গুণমানের জন্য ভারতীয় কফি বিশ্ব বিখ্যাত। আমাদের দেশে আরবীয় কফি উৎপাদন করা হয় যা প্রাথমিক অবস্থায় ইয়েমেন থেকে আনা হয়েছিল। সারা বিশ্বজুড়ে আরবীয় কফির বিপুল চাহিদা বিদ্যমান। এটির চাষ শুরুতে বাবাবুদান পাহাড়ি অঞ্চলে প্রথম চাষ করা হয়েছিল। আজও কফির চাষ নীলগিরি পাহাড়ের আশেপাশে কর্ণাটক, কেরালা ও তামিলনাড়ুতে করা হয়।

উদ্যানজাত ফসল (Horticulture Crops) : 2014 সালে চিনের পর ভারত ফল ও সবজি উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক দেশ ছিল। ভারত ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে উৎপন্ন ফলসমূহের উৎপাদক দেশ। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের আম; নাগপুর ও চেরাপুঞ্জী (মেঘালয়) এর কমলা; কেরালা, মিজোরাম, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর কলা; উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের লিচু ও পেয়ারা; মেঘালয় ও ত্রিপুরার আনারস; অন্ধ্র প্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও মহারাষ্ট্রে আঙুর; জম্মু ও কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশের আপেল, নাশপাতি, খুবানি (apricot) ও আখরোটের বিশ্বজুড়ে বিপুল চাহিদা রয়েছে।

চিত্র 4.12 : খুবানি (Apricot), আপেল ও বেদানা

ভারত পৃথিবীর মোট সবজি উৎপাদনের প্রায় শতকরা 13 ভাগ সবজি উৎপাদন করে। মটর, ফুলকপি, পেঁয়াজ, বাঁধাকপি, টম্যাটো, বেগুন ও আলু উৎপাদনে ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

চিত্র 4.13 : সবজির চাষ - মটর, ফুলকপি, টম্যাটো এবং বেগুন

খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য ফসল (Non-Food Crops)

রবার (Rubber) : রবার নিরক্ষীয় অঞ্চলের ফসল, কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে এটি ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলেও জন্মায়। এই ফসল উৎপাদনের জন্য 200 cm এর অধিক বৃষ্টিপাত এবং 25°c এর অধিক তাপমাত্রাসহ আর্দ্র স্যাঁতসেঁতে জলবায়ু প্রয়োজন।

রবার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পোৎপাদক কাঁচামাল। এটি প্রধানত কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং মেঘালয়ের গাড়ো পাহাড়ে ও ত্রিপুরায় জন্মায়। 2012-13 সালে ভারত পৃথিবীর প্রাকৃতিক রবার উৎপাদক দেশগুলোর মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল।

কাজ

রবারের তৈরি বস্তুগুলোর নামের তালিকা প্রস্তুত করো যা আমরা ব্যবহার করি।

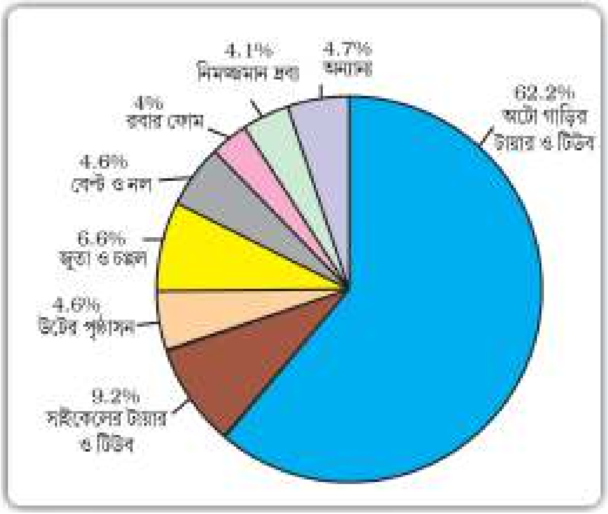

চিত্র 4.14 : প্রাকৃতিক রবারের ব্যবহার (2010-11)

উৎস : *Statistics and Planning Department Rubber Board, Kottayam, Kerala*

তন্তু ফসল (Fibre Crops) : কার্পাস (তুলা), পাট, শন এবং প্রাকৃতিক রেশম - এই চারটি প্রধান তন্তু ফসল ভারতে জন্মায়। প্রথম তিনটি মাটিতে জন্মায় এমন ফসল থেকে পাওয়া যায় এবং শেষেরটি রেশমকীটের কোকুন থেকে পাওয়া যায়, যারা বিশেষ করে মালবারি বৃক্ষের সবুজ পাতা খেয়ে বাঁচে। রেশম উৎপাদনের জন্য রেশমকীটের পালন '**রেশম গুটির চাষ (Sericulture)**' নামে পরিচিত।

কার্পাস (Cotton) : ভারতকে কার্পাস গাছের আদি স্থানরূপে গণ্য করা হয়। কার্পাস (তুলা) বস্ত্র বয়ন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। 2014

চিত্র 4.15 : তুলা বা কার্পাস চাষ

সালে চিনের পর ভারত কার্পাস উৎপাদনে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক দেশ ছিল। দাক্ষিণাত্য মালভূমির শুষ্ক অঞ্চলে তুলা ভালো জন্মায়। কার্পাস গাছের বৃদ্ধির জন্য উচ্চ তাপমাত্রা, স্বল্প বৃষ্টিপাত অথবা জলসেচ, 210 দিন তুহিনমুক্ত দিবস এবং উজ্জ্বল সূর্যকিরণ প্রয়োজন। এটি একটি খারিফ ফসল এবং এর পরিপক্কতার জন্য 6 থেকে 8 মাস প্রয়োজন। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ ভারতের প্রধান তুলা উৎপাদক রাজ্য।

পাট (Jute) : পাট সোনালি তন্তু নামে পরিচিত। এটি প্লাবন ভূমির জলনিকাশি সুবিধাযুক্ত উর্বর মাটিতে ভালো জন্মায় যেখানে প্রতি বছর নতুন মাটি সঞ্চয় হয়। পাট গাছের বৃদ্ধির সময় উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, ওড়িশা এবং মেঘালয় ভারতের পাট উৎপাদক রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রধান। এটি বস্তা, চাটাই, দড়ি, সুতা, কার্পেট এবং অন্যান্য হস্তনির্মিত শিল্পদ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পাটজাত দ্রব্যের উচ্চমূল্যের জন্য এবং কৃত্রিম তন্তু ও প্যাকিং সামগ্রী বিশেষ করে নাইলনের মূল্য কম হওয়ার কারণে এর বাজার ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

প্রযুক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত পুনর্গঠন (Technological and Institutional Reforms) :

আগের পৃষ্ঠাগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে কৃষিকাজ চলে আসছে। সুসংগঠিত প্রযুক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনের অভাবে অনবরত ভূমির জীবিকাভিত্তিক ব্যবহার কৃষির উন্নতির গতিকে ব্যাহত করেছে। জলসেচের উৎসের উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও দেশের বিশাল অংশের কৃষকরা আজও তাঁদের কৃষিকাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য মৌসুমি জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক উর্বরতার ওপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে এটি একটি

চিত্র 4.16 : কৃষিতে ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তিগত উপকরণ

গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যার শতকরা 60 ভাগের অধিক মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল কৃষিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত পুনর্গঠন প্রয়োজন। এভাবে, স্বাধীনতা লাভের পর দেশে প্রতিষ্ঠানগত পুনর্গঠনের জন্য যৌথ মালিকানা ব্যবস্থার প্রবর্তন, জোতজমির সুদৃঢ়করণ, সহযোগিতা এবং জমিদারি ব্যবস্থার সমাপ্তিকরণ ইত্যাদির ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'ভূমি সংস্কার' ছিল মূল লক্ষ্য। জমির ওপর বংশানুক্রমিক অধিকারের জন্য ইতোমধ্যে জোতজমিকে টুকরো করে বণ্টন করা হচ্ছিল যা জোতজমির সুদৃঢ়করণে অনিবার্য ছিল।

ভূমি সংস্কার আইন প্রণয়ন হয়েছিল, কিন্তু এর প্রয়োগে খানিকটা ঘাটতি ছিল। ভারত সরকার 1960 এবং 1970 দশকে ভারতীয় কৃষির উন্নতিসাধনে কৃষিক্ষেত্রের পুনর্গঠন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। প্যাকেজ টেকনোলোজির ওপর ভিত্তি করে সবুজ বিপ্লব এবং শ্বেত বিপ্লব (Operation Flood) এর মাধ্যমে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের প্রভূত উন্নতিতে বেশ কিছু নীতি প্রয়োগ করা শুরু হয়েছিল। তথাপি এর প্রভাবে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। এইজন্যে, 1980 এবং 1990 দশকে ব্যাপক ভূমি উন্নয়ন কর্মসূচি আরম্ভ করা হয়েছিল যা প্রযুক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত উভয়ের পুনর্গঠনের মাধ্যমে করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে খরা, বন্যা, ঝড়, আগুন ও রোগের প্রতিকারের জন্য ফসল বিমার ব্যবস্থা এবং কৃষকদের কম সুদের হারে ঋণের সুবিধা দেওয়ার জন্য গ্রামীণ ব্যাংক, কোঅপারেটিভ সোসাইটি ও ব্যাংক স্থাপনের মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল।

কৃষকদের লাভের জন্য ভারত সরকার কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (KCC), ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা যোজনা (PAIS) শুরু করেছিল। এছাড়াও কৃষকদের জন্য রেডিয়ো ও দূরদর্শনের মাধ্যমে আবহাওয়ার বিশেষ পরিস্থিতি ও কৃষি সংক্রান্ত কর্মসূচি প্রচারের সূচনা করা হয়েছিল। ফাটকা কারবারী ও দালালদের শোষণের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফসলের লাভজনক ক্রয়মূল্য ঘোষণা করা হয়েছিল।

ভূদান - গ্রামদান (Bhoodan - Gramdan)

মহাত্মা গান্ধি বিনোবা ভাবেকে তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছিলেন যিনি গান্ধিজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সবচেয়ে নিষ্ঠাবান সত্যাগ্রহীর মতো অংশ গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধিজির **গ্রাম স্বরাজ** ধারণার ওপর তাঁর গভীর আস্থা ছিল। গান্ধিজির দেহত্যাগের পর তাঁর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য বিনোবা ভাবে প্রায় সমগ্র দেশে **পদযাত্রা** করেছিলেন। একবার তিনি যখন অন্ধ্রপ্রদেশের পোচমপল্লি গ্রামে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন ভূমিহীন গরিব গ্রামবাসীরা তাঁদের আর্থিক ভরণ-পোষণের জন্য কিছু ভূমি দাবি করে। বিনোবা ভাবে তৎক্ষণাৎ তাঁদের কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি, কিন্তু তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যদি তাঁরা সরকারি জমিতে কৃষি করতে চায়, তাহলে ভারত সরকারের সাথে কথা বলে তাঁদের জন্য জমির ব্যবস্থা করবেন।

হঠাৎ শ্রী রামচন্দ্র রেড্ডি 80 জন ভূমিহীন গ্রামবাসীদের মধ্যে 80 একর জমি দানের জন্য এগিয়ে এলেন। এ ধরনের কাজ '**ভূমিদান**' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী সময়ে বিনোবা ভাবে সারা ভারত ভ্রমণ করে নিজের এই ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। কয়েকজন জমিদার যাঁরা অনেক গ্রামের মালিক ছিলেন, তাঁরা ভূমিহীনদের কিছু গ্রাম দান করেন। এটি '**গ্রাম দান**' নামে পরিচিত ছিল। যাই হোক, অনেক জমির মালিক 'ভূমি সীমা আইন' থেকে বাঁচার জন্য তাঁদের নিজস্ব জমির

কিছু অংশ গরিব কৃষকদের দান করেন। বিনোবা ভাবে কর্তৃক শুরু হওয়া এই ভূমিদান - গ্রামদান আন্দোলন **'রক্তপাতহীন বিপ্লব (Blood-less Revolution)'** নামেও পরিচিত।

কৃষির জাতীয় অর্থব্যবস্থা, রোজগার ও উৎপাদনের অবদান (Contribution of agriculture to the national economy, employment and output)

কৃষি ভারতের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। যদিও মোট দেশীয় উৎপাদনে (GDP) কৃষিকাজে যোগদানের অনুপাত 1951 সাল থেকে অনবরত ঘাটতি ঘটছে। তারপরেও 2010-11 সালে দেশের মোট কর্মশক্তির (Work force) প্রায় শতকরা 52 ভাগ খামার অঞ্চলে নিযুক্ত ছিল যা ভারতীয় জনসংখ্যার অর্ধেকের চেয়েও বেশি কৃষি নির্ভর মানুষের জীবিকা সাধিত হয়।

কৃষির মোট দেশীয় উৎপাদনের (GDP) অংশ কমে যাওয়া একটি গম্ভীর চিন্তার বিষয়, কারণ কৃষিতে যে-কোনো প্রকার ঘাটতি এবং উন্নয়ন দমে থাকা অর্থব্যবস্থার অন্য ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দেবে যা সমাজের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।

কৃষির গুরুত্ব বিবেচনা করে ভারত সরকার কৃষির আধুনিকীকরণে জোড় প্রচেষ্টা চালান। ভারতীয় কৃষির উন্নয়নে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (ICAR), কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পশু চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র এবং পশু প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন, উদ্যানবিদ্যার উন্নয়ন, আবহাওয়াবিদ্যার উন্নয়ন ও গবেষণা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া একই উদ্দেশ্যে গ্রাম্য পরিকাঠামোর উন্নতিও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

কাজ

খুঁজে বের করো কেন ভারতীয় কৃষকরা তাঁর পুত্রকে কৃষক বানাতে চায় না।

সারণি 4.1 থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, আগের বছরগুলোতে মোট দেশীয় উৎপাদনের হার বৃদ্ধি হলেও এতে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে রোজগারের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। কৃষিতে উন্নতির হার কমেছে যা এক প্রকার চিন্তাজনক পরিস্থিতি। বর্তমানে আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতা এবং কৃষিক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ কমে যাওয়ার কারণে ভারতীয় কৃষকরা এক বড়ো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। সারের ভরতুকি কমে যাওয়ায় কৃষির উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধির দিকে ঝুঁকছে। অধিকন্তু, কৃষিজ দ্রব্যের ওপর আমদানি কর হ্রাস দেশের কৃষিতে ক্ষতিকর

সারণি 4.1 : ভারতের মোট দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির শতকরা হার এবং প্রধান ক্ষেত্রসমূহ

ক্ষেত্র	2013-14	2014–15	2015-16
কৃষি	4·2	-0·2	1·1
শিল্প	5·0	5·9	7·3
পরিসেবা	7·8	10·3	9·2
মোট দেশীয় উৎপাদন (GDP)	**6·6**	**7·2**	**7·6**

উৎস : *Economic Survey 2015–16*

দ্রষ্টব্য : এগুলো অস্থায়ী তথ্য

প্রমাণিত হয়েছে। কৃষকরা কৃষিতে তাঁদের বিনিয়োগ কমিয়ে দিচ্ছে যার কারণে কৃষিতে রোজগারের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

কৃষকরা যখন অনেক সমস্যায় জর্জরিত এবং কৃষি জমির পরিমাণ কমছে, তখন আমরা কৃষিক্ষেত্রে বিকল্প রোজগারের সুযোগের কথা ভাবতে পারি কি ?

দেশের অনেক রাজ্যে কৃষকরা কেন আত্মহত্যা করে ?

খাদ্য সুরক্ষা (Food Security)

তোমরা জান খাদ্য একটি মৌলিক প্রয়োজন এবং দেশের প্রত্যেক নাগরিকের এরূপ খাদ্য পাওয়া উচিত যা ন্যূনতম পুষ্টিস্তর প্রদান করে। যদি আমাদের জনসংখ্যার যে-কোনো অংশ এই খাদ্য না পায়, তবে ওই অংশ খাদ্য সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। আমাদের দেশের কিছু অঞ্চলে বিশেষ করে আর্থিকভাবে কম উন্নত রাজ্যসমূহ যেখানে দরিদ্রতা ব্যাপক, সেখানে খাদ্য সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত জনসংখ্যায় বিশাল অসমঞ্জসতা রয়েছে। দেশের সুদূর অঞ্চলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং খাদ্য জোগানে অনিশ্চয়তার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। সমাজের সকল শ্রেণির জন্য খাদ্যের প্রাচুর্যতা সুনিশ্চিতকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সরকার সতর্কভাবে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা পদ্ধতি রচনা করে। এটি দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত, যথা-

a) আপতকালীন ভাণ্ডার (buffer stock)

b) সরকারি বণ্টন পদ্ধতি (PDS)

যেমন তোমরা জান, সরকারি বণ্টন পদ্ধতি (PDS) একটি কর্মসূচি যা গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভরতুকি মূল্যে দরিদ্র সীমার নীচে (BPL) বসবাসকারী লোকদের প্রদান করে।

ভারতের খাদ্য সুরক্ষা নীতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে পারে এমন খাদ্যশস্যের প্রাচুর্যতা সুনিশ্চিত করা। এতে গরিবরা খাদ্য পেতে সক্ষম হয়েছে। এই নীতি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মজুত বজায় রাখার জন্য ধান ও গমের অধিকমাত্রায় প্রাপ্তির ওপর সহায়ক মূল্য নির্ধারণের জন্য জোর দিচ্ছে। ভারতের খাদ্য নিগম (FCI) এর প্রধান কাজ হল খাদ্যশস্য উৎপাদন ও তা মজুত করা, যেখানে সরকারি বণ্টন পদ্ধতি (PDS) দ্বারা খাদ্যশস্যের বণ্টনকে সুনিশ্চিত করা হয়।

সরকারের ঘোষিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (MSP) ভারতের খাদ্য নিগম (FCI) কৃষকের কাছ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে। সরকার সার, শক্তি ও জল এর মতো প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণের ওপর ভরতুকি প্রদান করত। এখন এই ভরতুকির বোঝা বহন করা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এছাড়া এসব প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণগুলোর যথেচ্ছ ব্যবহারও হয়েছিল। জল ও সারের অধিক ও অবিবেচকের মতো ব্যবহারে জলমগ্নতা, লবণতা এবং মাটিতে প্রয়োজনীয় স্বল্পমাত্রিক পুষ্টি উপাদান কমে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিয়েছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের (MSP) উচ্চ হার কৃষি উপকরণের ভরতুকি এবং FCI কর্তৃক শর্তাধীন ক্রয় শস্য উৎপাদন পদ্ধতিকে বিগড়ে দিয়েছে। যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কৃষকরা পায় তার জন্য গম ও ধান অধিক পরিমাণে উৎপাদন করে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর ফলে আন্তঃ ফসল সমতায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছ যে, ভোক্তারা দুটো শ্রেণিতে বিভক্ত যথা- দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে (BPL) এবং দারিদ্র্য সীমারেখার উপরে (APL)। প্রত্যেক শ্রেণির ভোক্তাদের জন্য পৃথক মূল্য বিদ্যমান। কিন্তু এই শ্রেণি বিভাজন সঠিক নয়। কারণ এতে অনেক প্রকৃত গরিব বি পি এল শ্রেণিভুক্ত তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তাছাড়া এ পি এল অন্তর্ভুক্ত কিছু পরিবার একটি ফসল উৎপাদনেও ব্যর্থ হওয়ার কারণে বি পি এল শ্রেণিতে ফিরে এসেছে। ফলে প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এরূপ পরিবর্তনের সমন্বয়সাধন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

যদি সরকার উপযুক্ত কৃষি পরিকাঠামো, ঋণের সুবিধা দিতে পারে এবং কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করতে পারে, তাহলে প্রত্যেক জেলা এবং ব্লককে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বানানো যেতে পারে। শুধুমাত্র ধান ও গম উৎপাদনের প্রতি মনোনিবেশের পরিবর্তে ওই বিশেষ অঞ্চলে ভালো ফলন দেয় এমন খাদ্যশস্য উৎপাদনে অবশ্যই উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। কৃষিতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো যেমন জলসেচের সুবিধা, বিদ্যুৎ এর সহজলভ্যতা ইত্যাদি বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে পারে।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শস্যের মুক্ত বাণিজ্যের বাজার থাকলে অধিকমাত্রায় রোজগার সৃষ্টি করবে এবং গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রতা হ্রাস করবে।

ক্রমান্বয়ে খাদ্যশস্যের চাষ ফল, সবজি, তৈলবীজ ও উদ্যোগিক ফসল চাষের দিকে পরিবর্তিত হয়েছে। এর ফলে খাদ্যশস্য ও ডালের অন্তর্গত কৃষিজমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় দেশের ভবিষ্যৎ খাদ্য সুরক্ষা একটি বড়ো প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখীন। অকৃষি কাজের জন্য ব্যবহৃত ভূমি যেমন গৃহ নির্মাণ এবং কৃষির মধ্যে প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ার কারণে মোট চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ভূমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করেছে। সার, জীবাণুনাশক এবং কীটনাশক যেগুলো কোনো একটি সময় অভাবনীয় ফলাফল দিয়েছিল, আজ সেগুলোই মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাসের জন্য দায়ী। জলের সাময়িক অভাবে জলসেচের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের পরিমাণ কমে যায়। অদক্ষ জল পরিচালন ব্যবস্থাপনা ভূমিকে জলমগ্নতা ও লবণাক্ততার সমস্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ভূমি অবনমনও এগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কৃষকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগের কারণে স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল প্রয়োজন এমন ফসল (পাঞ্জাবের ধান, মহারাষ্ট্রের আখ) উৎপাদনের জন্য ভৌমজলকে পাম্পের

কাজ

বিগত পাঁচ বছরের ভারতের খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রবণতা দেখিয়ে একটি স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করো। এই প্রবণতার কারণ খুঁজে বের করো।

সারণি 4.2 : ভারতের খাদ্যশস্য উৎপাদন

(মিলিয়ন টন)

খাদ্যশস্য	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
ধান	105.30	105.24	106.54	105.48	104.32
গম	94.88	93.51	95.85	86.53	93.50
ভুট্টা	21.76	22.26	24.26	24.17	21.81
দানাশস্য	42.01	40.04	43.29	42.86	37.94
ডাল	17.09	18.34	19.25	17.15	16.47
মোট	**281.04**	**279.39**	**289.19**	**276.19**	**274.04**

উৎস : *Directorate of Economics and Statistics. DAC@FW, Ministry of Agriculture, Economic Survey 2015–16.*

সাহায্যে তুলে কৃষিকার্যে উৎসাহিত করা হয়েছে। এইরূপ অবিবেচক জল উত্তোলনে ভূ-নিম্নস্থ জলাধারের (Aquifers) জল কমে গিয়েছে। একইভাবে অনেক কুয়ো ও নলকূপ শুকিয়ে গিয়েছে। এরফলে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা কৃষি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

বড়ো কৃষকরা তাঁদের গভীর নলকূপগুলোর সাহায্যে এখনও জল পায়, অথচ অন্যান্য অনেক কৃষক জল সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। অপর্যাপ্ত ভাণ্ডার এবং বাজারের অভাবে চাষি নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছে। এভাবে কৃষকরা উৎপাদন এবং বাজারের অনিশ্চয়তার দরুন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাঁরা দু'ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একদিকে যেমন- উচ্চ ফলনশীল বীজ, সার ইত্যাদির মতো কৃষি জোগানের জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হয়, অপরদিকে নিজেদের অনুকূলে বিক্রয়মূল্য স্থির করতে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ করতে হয়। কৃষকের উৎপাদিত সকল দ্রব্য একই সঙ্গে বাজারজাত হয়। বাজারে দ্রব্যের বিশাল জোগানের পাশাপাশি চাহিদা কমে যাওয়ায় দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য শোচনীয়ভাবে হ্রাস পায়। অতএব ক্ষুদ্র চাষিদের সুরক্ষা ছাড়া খাদ্য সুরক্ষা সম্ভব নয়।

কৃষির ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব

(Impact of Globalisation on agriculture)

বিশ্বায়ন কোনো নতুন ঘটনা নয়। ঔপনিবেশিক কালেও এর উপস্থিতি ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা ভারতে এসেছিলেন, সেই সময়ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতের মশলা রপ্তানি হয়েছিল এবং দক্ষিণ ভারতের কৃষকদের এই মশলা উৎপাদনে উৎসাহিত করা হয়েছিল। আজ পর্যন্ত ভারত থেকে রপ্তানিকৃত দ্রব্যের মধ্যে মশলা একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি দ্রব্য।

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের তুলা উৎপাদক অঞ্চল ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের আকর্ষণ করেছিল এবং পরিশেষে বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ভারতের তুলা ব্রিটেনে রপ্তানি হয়েছিল। ভারতের উন্নতমানের তুলা প্রাপ্তির সুবিধা থাকার কারণে ম্যাঞ্চেস্টার ও লিভারপুলে জমজমাট বস্ত্র শিল্প গড়ে ওঠে। তোমরা চম্পারণ আন্দোলন সম্পর্কে পড়েছ

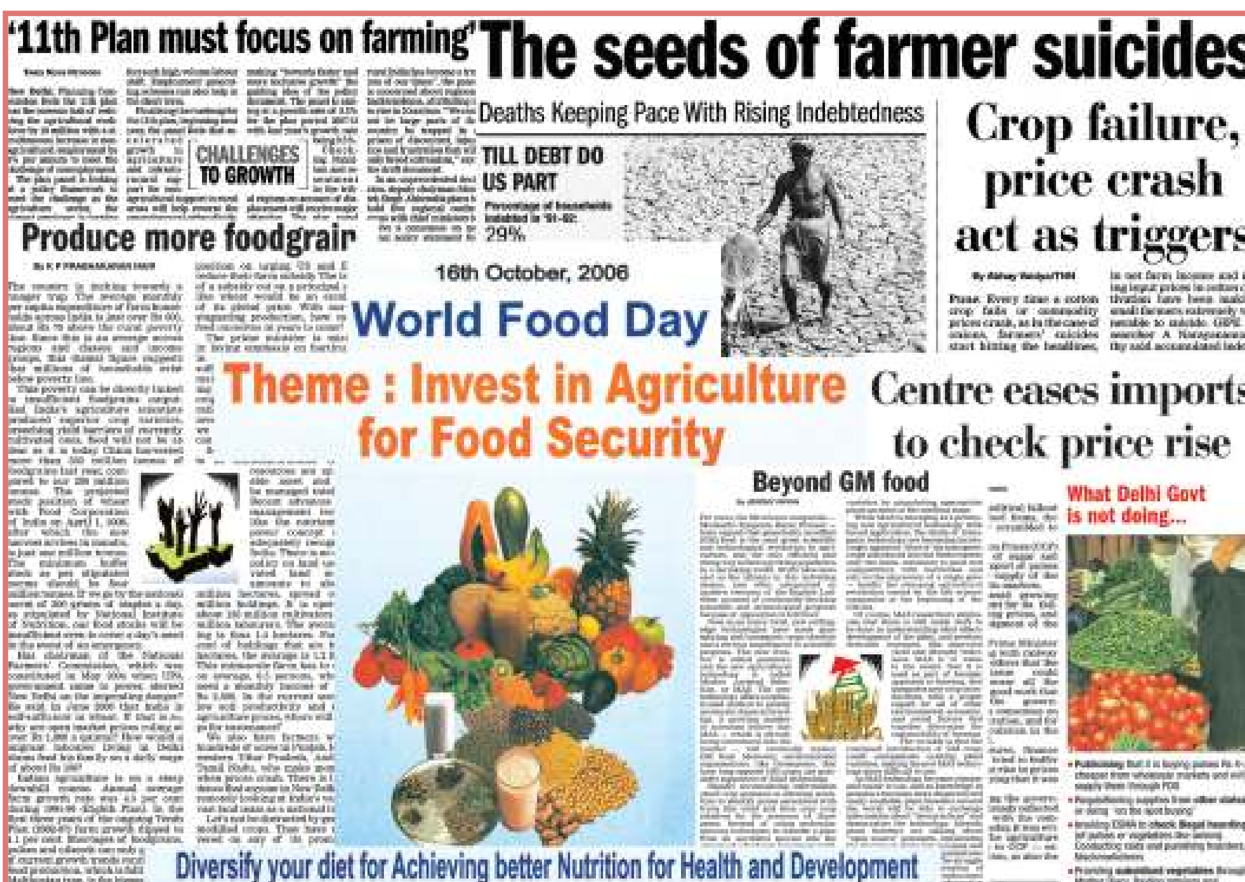

কাজ

ভারতের খাদ্য সুরক্ষা - এর প্রয়োজনীয়তা ও চেষ্টা — এই বিষয়ের ওপর একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করো।

যা 1917 সালে বিহারে আরম্ভ হয়েছিল। এই অঞ্চলের কৃষকদের নীল চাষ করতে বাধ্য করার জন্যই আন্দোলনের সূচনা হয়। কারণ ব্রিটেনের বস্ত্র শিল্পের জন্য কাঁচামাল হিসাবে এখানকার নীলের প্রয়োজন ছিল। কৃষকরা তাদের পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারত না।

বিশ্বায়নের প্রভাবে বিশেষ করে 1990 সালের পর ভারতীয় কৃষকরা নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। ধান, তুলা, রবার, চা, কফি, পাট ও মশলার মুখ্য উৎপাদক হওয়া সত্ত্বেও ভারতের কৃষিদ্রব্য বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করতে সামর্থ্য ছিল না, কারণ ওই দেশগুলোর কৃষিতে অত্যধিক হারে ভরতুকি প্রদান করা হত।

চিত্র 4.17 : সেগুন গাছের ক্লোনের কলা পালন, (Tissue culture of teak clones)

আজ ভারতীয় কৃষি নিজেই সিদ্ধান্তহীনতার সম্মুখীন। কৃষিকে সফল এবং লাভজনক বানাতে প্রান্তিক ও ছোটো কৃষকদের পরিস্থিতি উন্নয়নে জোড় দেওয়া উচিত। সবুজ বিপ্লব অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু এটি আজ বিতর্কে জড়িয়ে গেছে। এর কারণ রাসায়নিক পদার্থের অধিক ব্যবহার, ভূ-নিম্নস্থ জলাধার শুকিয়ে যাওয়া এবং জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির জন্য ভূমিক্ষয়। আজ 'জিনগত বিপ্লব (Gene Revolution)' একটি সাংকেতিক শব্দ যা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর অন্তর্ভুক্ত।

নতুন নতুন সংকর প্রজাতির বীজ আবিষ্কারের শক্তিশালী মাধ্যম হল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং।

তোমরা ভারতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত যে-কোনো জিন রূপান্তরিত বীজের নাম বলতে পারো ?

চিত্র 4.18 : উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ অধিক পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহারে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন।

বাস্তবে জৈব কৃষি আজ অধিক প্রচলিত, কারণ সার ও কীটনাশকের মতো কারখানায় প্রস্তুত রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার না করে এই কৃষি করা হয়। ফলে এরূপ কৃষির মাধ্যমে পরিবেশে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না।

কিছু অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ছোটো ছোটো জোত জমিতে অনবরত খাদ্যশস্য উৎপাদন করে, তাহলে ভারতীয় কৃষকদের ভবিষ্যত অন্ধকার। 2011 সালের তথ্যানুযায়ী ভারতের গ্রামীণ জনসংখ্যা প্রায় 833 মিলিয়ন যার প্রায় 250 মিলিয়ন হেক্টর কৃষিজমির ওপর নির্ভরশীল। এই হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে আধা হেক্টরের চেয়ে কম জমি পায়।

ভারতীয় কৃষকদের শস্যের ধরন পরিবর্তন করে খাদ্যশস্যের স্থানে উচ্চ মূল্যের শস্য উৎপাদন করা উচিত। এর মাধ্যমে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং একই সাথে পরিবেশের অবনমন হ্রাস পাবে। কারণ ফল, ঔষধি গাছ, ফুল, সবজি, বায়ো-ডিজেল ফসলের মতো জেট্রোফা ও জোজোবা ফসল উৎপাদনে ধান ও আখ চাষের তুলনায় অনেক কম জলসেচ প্রয়োজন হয়। ভারতের বৈচিত্র্যময় জলবায়ুতে বিস্তৃত পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার উচ্চ মূল্যের শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

খাদ্যশস্যের স্থানে উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন করে শস্যের ধরন পরিবর্তনের অর্থ হল ভারতকে খাদ্য সামগ্রী আমদানি করতে হবে। 1960 এর দশকে এটিকে একটি বিপর্যয় হিসাবে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু যদি ভারত উচ্চ মূল্যের ফসল রপ্তানি করে এবং খাদ্যশস্য আমদানি করে তাহলে ইতালি, ইজরায়েল ও চিলি দেশের মতো ভারতের অর্থনীতি সফল হবে। এই দেশগুলো বিভিন্ন কৃষিজ পণ্য (যেমন ফল, জলপাই, বিশেষ বীজ এবং মদ ইত্যাদি) রপ্তানি করে এবং খাদ্যশস্য আমদানি করে। এই ঝুঁকি নিতে আমরা কি প্রস্তুত আছি ? এই বিষয়ের ওপর বিতর্ক করো।

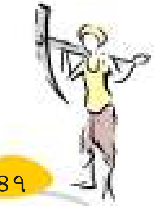

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তর বাছাই করো :

i) নিম্নলিখিত কোন্ কৃষি পদ্ধতিটি বিশাল অঞ্চলে একটি মাত্র ফসল উৎপাদনকে বর্ণনা করে ?

a) স্থানান্তর কৃষি　　b) বাগিচা কৃষি

c) উদ্যান কৃষি　　d) প্রগাঢ় কৃষি

ii) নিম্নলিখিত কোন্‌টি রবিশস্য ?

a) ধান　　b) ছোলা

c) মিলেট　　d) কার্পাস

iii) নিম্নলিখিত কোন্‌টি শিম্বগোত্রীয় (Leguminous) ফসল ?

a) ডাল　　b) জোয়ার

c) মিলেট　　d) তিল

iv) নিম্নলিখিত কোন্‌টি ফসলের সহায়ক হিসাবে সরকার ঘোষণা করে ?

a) সর্বোচ্চ সহায়ক মূল্য　　b) ন্যূনতম সহায়ক মূল্য

c) নিয়ন্ত্রিত সহায়ক মূল্য　　d) প্রভাবিত সহায়ক মূল্য

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

a) একটি গুরুত্বপূর্ণ পানীয় ফসলের নাম লেখো এবং এর উৎপাদনের জন্য অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ উল্লেখ করো।

b) ভারতের একটি মুখ্য ফসলের নাম লেখো এবং এর উৎপাদক অঞ্চলগুলোর নাম লেখো।

c) কৃষকদের স্বার্থে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার কর্মসূচির তালিকা তৈরি করো।

d) দিনের পর দিন কৃষির অন্তর্গত জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। তুমি কি এর পরিণাম কল্পনা করতে পারো ?

3. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 120 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

a) কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে সরকার কর্তৃক গৃহীত কিছু পদক্ষেপ উল্লেখ করো।

b) ভারতীয় কৃষির ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব বর্ণনা করো।

c) ধানের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের বর্ণনা দাও।

প্রকল্প কাজ (Project Work)

1. কৃষকদের স্বাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তার ওপর দলগত আলোচনার আয়োজন করো।

2. ভারতের মানচিত্রে গম উৎপাদক অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করো।

কাজ (Activity)

গোপন উত্তর খুঁজে পেতে নীচের ছকটি অনুভূমিকভাবে (Horizontally) এবং উল্লম্বভাবে (Vertically) অনুসন্ধান করো এবং ধাঁধাটি সমাধান করো।

নোট : ধাঁধার উত্তর ইংরেজি শব্দে দেওয়া আছে।

A	Z	M	X	N	C	B	V	N	X	A	H	D	Q
S	D	E	W	S	R	J	D	Q	J	Z	V	R	E
D	K	H	A	R	I	F	G	W	F	M	R	F	W
F	N	L	R	G	C	H	H	R	S	B	S	V	T
G	B	C	W	H	E	A	T	Y	A	C	H	B	R
H	R	T	K	A	S	S	E	P	H	X	A	N	W
J	I	E	S	J	O	W	A	R	J	Z	H	D	T
K	C	L	A	E	G	A	C	O	F	F	E	E	Y
L	T	E	F	Y	M	T	A	T	S	S	R	G	I
P	D	E	J	O	U	Y	V	E	J	G	F	A	U
O	U	M	H	Q	S	U	D	I	T	S	W	S	P
U	O	A	C	O	T	T	O	N	E	A	H	F	O
Y	O	L	F	L	U	S	R	Q	Q	D	T	W	I
T	M	U	A	H	R	G	Y	K	T	R	A	B	F
E	A	K	D	G	D	Q	H	S	U	O	I	W	H
W	Q	Z	C	X	V	B	N	M	K	J	A	S	L

1. ভারতের দুটি প্রধান খাদ্যশস্য।
2. এটি ভারতবর্ষের একটি গ্রীষ্মকালীন ফসলের ঋতু।
3. অড়হর, মুগ, ছোলা, উরাদ ইত্যাদি ডালে থাকে ...
4. এটি একটি দানাশস্য।
5. ভারতবর্ষের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পানীয় ফসল হল ...
6. কৃষ্ণ মৃত্তিকায় উৎপাদিত চারটি তন্তু ফসলের মধ্যে একটি প্রধান ফসল হল ...।

খনিজ এবং শক্তি সম্পদসমূহ

MINERALS AND ENERGY RESOURCES

হ্যাবান নিজের বাবার সঙ্গে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে গৌহাটিতে এসেছে।

সে লোকজনদের ঘরের মতো অদ্ভুত বস্তুর ভেতর প্রবেশ করতে দেখছে যা রাস্তার মধ্যে চলাচল করে। সে একটি রান্নাঘরকেও অনেকগুলো ঘরের সাথে যেতে দেখেছে। সে অবাক হয়ে তার বাবকে জিজ্ঞাসা করে, "বাবা আমাদের ঘর ওই রকম কেন চলে না, যেরকম আমরা গৌহাটিতে দেখেছিলাম ?"

তার বাবা উত্তর দিলেন "এগুলো বাড়িঘর নয়, এগুলো হচ্ছে বাস এবং ট্রেন। আমাদের বাড়িঘরের মতো এগুলো ইট এবং পাথর দিয়ে তৈরি নয়, এগুলো লোহা এবং অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি। । এগুলো আপনা থেকে চলে না, ইঞ্জিন দিয়ে চালিত, যার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধাতু দিয়ে তৈরি বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করে থাকি। তোমরা কি তোমাদের বাড়িতে ব্যবহৃত ধাতু দ্বারা তৈরি বস্তুসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে ? এই ধাতুসমূহ কোথা থেকে আসে ?

তোমরা অধ্যয়ন করেছ যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ বিভিন্ন খনিজের সমন্বয়ে তৈরি শিলা দ্বারা গঠিত। এই খনিজগুলোকে যথাযথ পরিশোধন করে বিভিন্ন প্রকার ধাতু নিষ্কাশন করা হয়।

খনিজ হচ্ছে আমাদের জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। আমরা যা কিছু ব্যবহার করি তার মধ্যে প্রায় সবকিছুই যেমন- একটি ছোটো পিন থেকে আরম্ভ করে সুউচ্চ ভবন বা একটি বড়ো জাহাজ সবই খনিজ দিয়ে তৈরি। রেলপথের লাইন ও রাস্তার নুড়ি, আমাদের কারিগরি যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম ও খনিজ দিয়ে তৈরি। গাড়ি, বাস, রেলগাড়ি, বিমান সব খনিজ দ্বারা নির্মিত এবং ভূভাগ থেকে প্রাপ্ত শক্তিসম্পদ দ্বারা চালিত হয়। এমনকি আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তাতেও খনিজ রয়েছে। বিকাশের সকল স্তরে মানুষ তার জীবিকা, সাজসজ্জা, উৎসব, ধার্মিক এবং আচার অনুষ্ঠানে খনিজ ব্যবহার করে আসছে।

খনিজ এবং টুথপেস্ট থেকে এক উজ্জ্বল হাসি
(A Bright smile from toothpaste and Minerals)

টুথপেস্ট তোমাদের দাঁতকে পরিষ্কার করে। কিছু অবঘর্ষক খনিজসমূহ যেমন- সিলিকা (Silica), চুনাপাথর (Limestone), অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Aluminium Oxide) এবং বিভিন্ন ফসফেট খনিজকে পরিষ্কার করে থাকে। ফ্লোরাইড (Flouride) যা দাঁতে গর্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে তা ফ্লোরাইট (Flourite) নামক খনিজ থেকে আসে। টাইটেনিয়াম অক্সাইড ব্যবহার করে অধিকাংশ টুথপেস্টকে সাদা বানানো হয় যা রুটাইল (Rutile), ইলমেনাইট (Ilmenite) এবং অ্যানাটেজ (Anatase) নামক খনিজ থেকে পাওয়া যায়। কিছু কিছু টুথপেস্টে যে ঔজ্জ্বল্য দেখা যায় তা অভ্র (Mica) থেকে আসে। টুথব্রাশ এবং পেস্টের টিউব প্লাস্টিক দিয়ে নির্মিত যা পেট্রোলিয়াম থেকে আসে। এসব খনিজ কোথায় পাওয়া যায় ? খুঁজে বের করো।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করো : একটি আলো প্রদানকারী বাল্ব বানাতে কয়টি খনিজ ব্যবহার করা হয় তা খুঁজে বের করো।

সকল প্রকার জীবিত জীবের জন্য খনিজ প্রয়োজন
(All Living Things need Minerals)

খনিজ ছাড়া জীবন প্রক্রিয়া চলতে পারে না। যদিও আমাদের গৃহীত মোট পুষ্টিকর পদার্থের মাত্র 0.3 শতাংশই খনিজ। তথাপি তা এত গুরুত্বপূর্ণ এবং গুণসম্পন্ন যে এগুলো ছাড়া আমরা অবশিষ্ট 99.7 শতাংশ ভোজ্য পদার্থের ব্যবহার করতে সমর্থ হতাম না।

একটু গভীরে চিন্তা করো : খাদ্য তালিকায় দেওয়া "পুষ্টিকর তথ্য" সংগ্রহ করো।

খনিজ কী ? (What is a Minerals ?)

ভূতত্ত্ববিদদের মতানুসারে খনিজ হচ্ছে "প্রাকৃতিক রূপে বিদ্যমান সমসত্ত্ব পদার্থ যার একটি নির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ গঠন রয়েছে।" খনিজ প্রকৃতিতে বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়, যথা- কঠোরতম হিরা থেকে কোমলতম ট্যাল্ক পর্যন্ত। কেন এগুলো এত ভিন্ন প্রকৃতির হয় ?

তোমরা ইতোমধ্যেই শিলা সম্পর্কে জেনেছ। শিলা সমসত্ত্ব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত, যাকে **খনিজ** বলা হয়। কিছু শিলা, উদাহরণস্বরূপ চুনাপাথর একটি মাত্র খনিজ দ্বারা গঠিত, কিন্তু অধিকাংশ শিলা বিভিন্ন অনুপাতের বিভিন্ন খনিজ দিয়ে গঠিত। যদিও 2000 এর বেশি খনিজ পদার্থ শনাক্ত করা হয়েছে, তথাপি বেশিরভাগ শিলায় কেবলমাত্র কিছু খনিজই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

একটি নির্দিষ্ট খনিজ যা বিশেষ উপাদানসমূহের সমন্বয়ে গঠিত তা নির্ভর করে পদার্থের প্রাকৃতিক এবং রাসায়নিক অবস্থার ওপর। এর ফলস্বরূপ খনিজে বিভিন্ন বর্ণ, কাঠিন্যতা, স্ফটিকতা, উজ্জ্বলতা এবং ঘনত্ব দেখা যায়। ভূতত্ত্ববিদ খনিজকে শ্রেণিবিভাগ করার জন্য এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যবহার করেন।

ভূগোলবিদ এবং ভূতত্ত্ববিদদের দ্বারা খনিজের অধ্যয়ন
Study of Minerals by Geographers and Geologist

ভূগোলবিদরা ভূমিরূপসমূহকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য খনিজের অধ্যয়নকে ভূপৃষ্ঠের একটি অংশ রূপে মনে করেন। খনিজ সম্পদের বণ্টন এবং তার সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপসমূহ হচ্ছে ভূগোলবিদদের আগ্রহের বিষয়। তবে একজন ভূতত্ত্ববিদ খনিজের গঠন, সৃষ্টির সময়কাল এবং প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে বেশি আগ্রহী।

যাই হোক, সাধারণ এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে খনিজকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে।

খনিজ নিষ্কাশনের বাণিজ্যিক গুরুত্ব তখনই থাকে যখন খনিজ আকরিকের সঞ্চয় যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। খনিজসমূহের খননের সুবিধা এগুলোর গঠনের ওপর নির্ভর করে। এটি নিষ্কাশনের মূল্যও নির্ধারণ করে। অতএব আমাদের জন্য প্রধান শিলাসমূহের গঠন সম্পর্কে জানা খুবই প্রয়োজনীয়, কেন না এগুলোতেই খনিজ পাওয়া যায়।

সাধারণত খনিজ নিম্নলিখিত রূপে পাওয়া যায় :

i) আগ্নেয় এবং রূপান্তরিত শিলার ফাটল, চিড়, চ্যুতি অথবা সংযোগস্থলে খনিজ পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রতর সঞ্চয় **শিরা** রূপে এবং বৃহত্তম সঞ্চয় **পরিখা** বা **খাতে** দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো গঠিত হয় যখন খনিজসমূহ তরল বা গলিত এবং গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো গর্ত বা ছিদ্রপথের মাধ্যমে উপরের দিকে ভূপৃষ্ঠে যেতে বাধ্য হয়। উপরে আসার সময় এগুলো শীতল হয় এবং জমাট বাঁধে। প্রধান ধাতব খনিজসমূহ যেমন- টিন, তামা, জিঙ্ক এবং সিসা ইত্যাদি এরকম শিরা এবং পরিখাতে পাওয়া যায়।

ii) বহুসংখ্যক খনিজ পাললিক শিলাস্তরে বা স্তরায়ন তলে পাওয়া যায়। এগুলোর অনুভূমিক স্তরে সঞ্চয়ন, পুঞ্জীভবন এবং কেন্দ্রীভবনের ফলে গঠিত হয়েছে। কয়লা এবং কিছু কিছু লৌহ আকরিক দীর্ঘকালীন অত্যধিক চাপ ও তাপের ফলে তৈরি হয়। পাললিক শিলায় অন্যান্য শ্রেণির খনিজের মধ্যে জিপসাম, পটাশ লবণ এবং সোডিয়াম লবণ উল্লেখযোগ্য। এগুলো বিশেষত

খনিজের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Minerals)

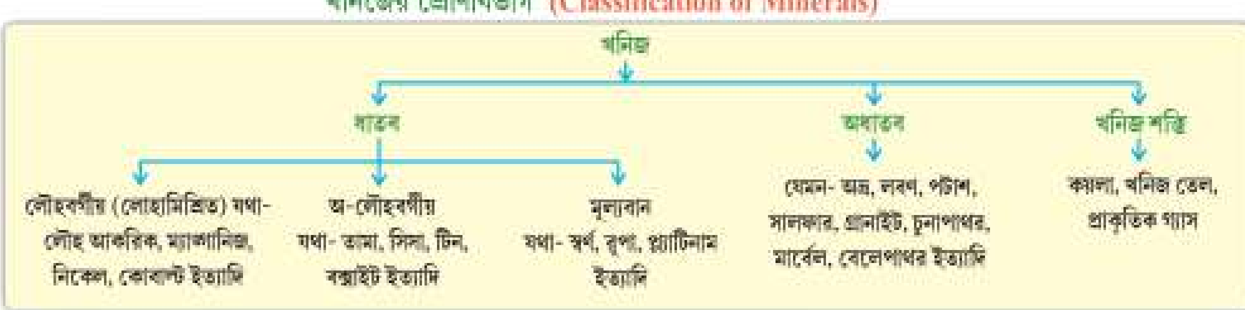

চিত্র 5.1

খনিজের প্রাপ্যতা (Mode of Occurrence of Minerals)

এসব খনিজ কোথায় পাওয়া যায় ?

খনিজ সাধারণত 'আকরিক'-এ পাওয়া যায়। 'আকরিক' শব্দটি বলতে যে-কোনো খনিজের সাথে অন্যান্য উপাদানের মিশ্রণকে বোঝায়।

শুষ্ক অঞ্চলে **বাষ্পীভবনের** ফলে সৃষ্ট হয়।

iii) খনিজ সৃষ্টির একটি অন্যতম প্রক্রিয়া হচ্ছে ভূপৃষ্ঠীয় শিলার বিয়োজন এবং দ্রবণীয় পদার্থের অপসারণ, যার ফলে আবহবিকার দ্বারা আকরিক সমৃদ্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত শিলার অবশিষ্টাংশ

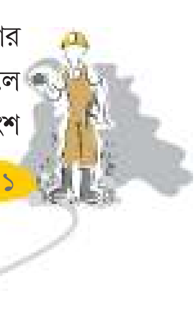

পড়ে থাকে। বক্সাইট এভাবে গঠিত হয়ে থাকে।

iv) পাহাড়ের তলদেশে এবং উপত্যকার তলদেশের বালিতে পলি সঞ্চয় রূপেও বিশেষ কিছু খনিজ পাওয়া যায়। এই সঞ্চয়গুলোকে 'প্লেসার অবক্ষেপ (Placer deposits)' বলা হয় এবং সাধারণত এমন খনিজ থাকে যা জল দ্বারা জারিত হয় না। এরূপ খনিজের মধ্যে স্বর্ণ, রূপা, টিন এবং প্ল্যাটিনাম গুরুত্বপূর্ণ।

v) মহাসাগরের জলসমূহে বিশাল পরিমাণে খনিজ থাকে। কিন্তু এর অধিকাংশই ব্যাপকভাবে বিক্ষিপ্ত থাকে, তাই এর আর্থিক গুরুত্ব কম। তথাপি, সাধারণ লবণ, ম্যাগনেসিয়াম এবং ব্রোমিন মহাসাগরের জল থেকে পাওয়া যায়। মহাসাগরীয় তলদেশও 'ম্যাঙ্গানিজ নোডিউলস্ (Manganeze Nodules)'-এ সমৃদ্ধ।

মজাদার তথ্য

র‍্যাট হোল (Rat-Hole) খনন : তোমরা কি জান যে, ভারতে অধিকাংশ খনিজ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে এবং তাদের নিষ্কাশন শুধুমাত্র সরকার থেকে উপযুক্ত অনুমতি নেওয়ার পরই সম্ভব ? কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের অধিকাংশ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় খনিজগুলো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন। মেঘালয়ে কয়লা, লৌহ আকরিক, চুনাপাথর এবং ডলোমাইট ইত্যাদির প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় রয়েছে। জোয়াই এবং চেরাপুঞ্জিতে কয়লার খনন পরিবারের সদস্যদের দ্বারা এক লম্বা সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ রূপে করা হয়, একে 'র‍্যাট হোল' (Rate-Hole) খনন বলা হয়।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করো : একটি উন্মুক্ত খনি, একটি খনি এবং একটি সুড়ঙ্গাযুক্ত ভূগর্ভস্ত খনির মধ্যে পার্থক্য কী ?

বিভিন্ন প্রকার খনিজ সম্পদে ভারত যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী। তবে, এগুলো অসমভাবে বণ্টিত। বিশদভাবে বলতে গেলে উপদ্বীপীয় শিলায় কয়লা, ধাতব খনিজ, অভ্র এবং অন্য অনেক অধাতব খনিজ পদার্থের অধিকাংশ ভাণ্ডার সঞ্চিত রয়েছে। উপদ্বীপের পশ্চিম এবং পূর্ব পার্শ্বের গুজরাট এবং আসামের পাললিক শিলায় অধিকাংশ খনিজতেলের ভাণ্ডার পাওয়া যায়। উপদ্বীপীয় শিলাপ্রক্রিয়ার সঙ্গে রাজস্থানে বহু অ-লৌহবর্গীয় খনিজ পদার্থের ভাণ্ডার মজুত রয়েছে। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ পলিসমভূমি অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ থেকে বঞ্চিত। এই বিভিন্নতা মূলত খনিজ সৃষ্টির ভূতাত্ত্বিক গঠন, প্রক্রিয়া এবং সময়ের ওপর নির্ভর করে।

এখন, চলো আমরা ভারতের কয়েকটি প্রধান খনিজ পদার্থের বণ্টন নিয়ে অধ্যয়ন করি। সবসময় মনে রাখা প্রয়োজন যে, আকরিক খনিজের পুঞ্জীভবন, উত্তোলনে সহজসাধ্যতা এবং বাজারের নৈকট্য কোনো ভাণ্ডারের অর্থনৈতিক কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই চাহিদা মেটাবার জন্য বহুবিধ সম্ভাব্য বিকল্পগুলোর মধ্যে একটি বাছাই করতে হয়। যখন এটি করা হয় তখন একটি খনিজের 'সঞ্চয়' বা 'ভাণ্ডার' খনিতে পরিবর্তিত হয়।

লৌহবর্গীয় খনিজ (Ferrous Minerals)

ধাতব খনিজের মোট উৎপাদন মূল্যের তিন-চতুর্থাংশ হল লৌহবর্গীয় খনিজ। এটি ধাতব শিল্পের বিকাশে মজবুত ভিত্তি প্রদান করে। ভারত অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাবার পর বিশাল মাত্রায় লৌহ খনিজ রপ্তানি করে।

লৌহ আকরিক (Iron Ore)

লৌহ আকরিক হল প্রধান খনিজ পদার্থ এবং শিল্প বিকাশের মেরুদণ্ড। ভারতে লৌহ আকরিকের বিপুল সম্ভার বিদ্যমান। ভারত উৎকৃষ্ট মানের লৌহ আকরিকে সমৃদ্ধ। ম্যাগনেটাইট হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক এবং এতে লৌহের পরিমাণ থাকে 70 শতাংশেরও বেশি। এর চৌম্বকীয় গুণমান সর্বোৎকৃষ্ট, বিশেষত বৈদ্যুতিক শিল্পে এর প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। হেমাটাইট হল সবচেয়ে প্রধান শিল্পভিত্তিক লৌহ আকরিক যা পরিমাণের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ম্যাগনেটাইট এর অপেক্ষায় এতে লোহার পরিমাণ একটু কম থাকে (50-60 শতাংশ)।

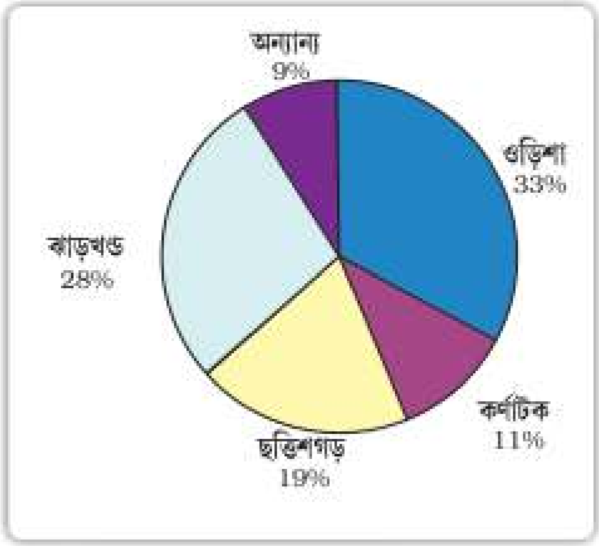

চিত্র 5.2 : লৌহ আকরিক উৎপাদনে রাজ্যভিত্তিক ভাগ (শতাংশে), 2009-10

তোমরা জান কি ?

কন্নড় ভাষায় কুদ্রে (Kudre) শব্দের অর্থ হল ঘোড়া। কর্ণাটকের পশ্চিমঘাটের উচ্চতম শৃঙ্গ ঘোড়ার মুখের মতো। বাইলাডিলা পাহাড় দেখতে ষাঁড়ের কুঁজের মতো এবং তার জন্যই এর নাম এরকম দেওয়া হয়েছে।

চিত্র 5.3 : লৌহ আকরিক খনি

ভারতের প্রধান প্রধান লৌহ আকরিক বলয়গুলো হল :

- ***ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড বলয় (Odisha-Jharkhand Belt) :*** ওড়িশায় উচ্চমানের হেমাটাইট আকরিক ময়ূরভঞ্জ এবং কেন্দুঝার জেলার বাদামপাহাড় খনিতে পাওয়া যায়। এর সংলগ্ন ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলার অন্তর্গত গুয়া এবং নোয়ামুন্ডি এর খনি থেকে লৌহ আকরিক উত্তোলন করা হয়।
- ***দুর্গ-বাস্তার-চন্দ্রপুর বলয় (Durg-Bastar-Chandrapur Belt) :*** এই বলয়টি ছত্তিশগড় এবং মহারাষ্ট্রে অবস্থিত। ছত্তিশগড়ের বাস্তার জেলার অন্তর্গত বাইলাডিলা পাহাড় শ্রেণিতে খুবই উচ্চমানের হেমাটাইট পাওয়া যায়। এই পাহাড় শ্রেণিতে অতি উচ্চমানের হেমাটাইট লৌহ আকরিকের 14টি ভাণ্ডার মজুত রয়েছে। এতে ইস্পাত তৈরি করার প্রয়োজনীয় সর্বোৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক গুণমান রয়েছে। এই খনিগুলো থেকে লৌহ আকরিক বিশাখাপত্তনম বন্দরের মাধ্যমে জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া দেশে রপ্তানি করা হয়।
- ***বেল্লারি-চিত্রদুর্গ-চিক্কামাগালুরু-টুমাকুরু বলয় (Ballari-Chitradurga-Chikkamagaluru-Tumakuru Belt) :*** কর্ণাটকে অবস্থিত এই বলয়টিতে লৌহ আকরিকের বিশাল ভাণ্ডার সঞ্চিত রয়েছে। কর্ণাটকের পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় অবস্থিত কুদ্রেমুখ খনি হল একশ শতাংশ রপ্তানির একক। কুদ্রেমুখে সঞ্চিত ভাণ্ডারটি বিশ্বের সবচেয়ে বিশালতম সঞ্চয় ভাণ্ডারের মধ্যে একটি। লৌহ আকরিক কর্দম (Slurry) রূপে পাইপলাইন দিয়ে ম্যাঙ্গালুরুর কাছাকাছি একে বন্দরে পাঠানো হয়।
- ***মহারাষ্ট্র-গোয়া বলয় (Maharastra-Goa Belt) :*** এতে গোয়া এবং মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি জেলা অন্তর্ভুক্ত। যদিও এখানকার আকরিকসমূহ খুব উচ্চমানের নয়, তবুও এগুলোকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়। মার্মাগাঁও বন্দর দিয়ে এখানকার লৌহ আকরিক রপ্তানি করা হয়।

ম্যাঙ্গানিজ (Manganese) : ম্যাঙ্গানিজ প্রধানত ইস্পাত এবং লৌহ-ম্যাঙ্গানিজ সংকর ধাতু তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এক টন ইস্পাত তৈরি করার জন্য প্রায় 10কেজি ম্যাঙ্গানিজ প্রয়োজন। এটি ব্লিচিং পাউডার, কীটনাশক ওষুধ এবং রং তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

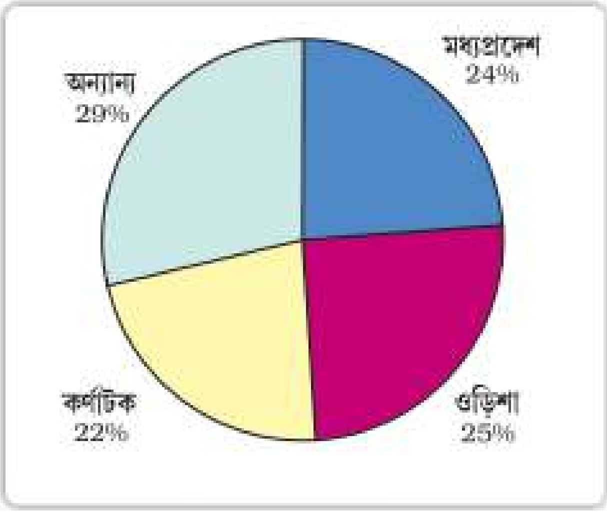

চিত্র 5.4 : ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে রাজ্যভিত্তিক ভাগ (শতাংশ), 2009-2010

ভারতের মধ্যে ওড়িশা হল সবচেয়ে বেশি ম্যাঙ্গানিজ আকরিক উত্তোলনকারী রাজ্য। 2000-01সালে দেশের মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ এখান থেকে পাওয়া যায়।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করো : ভারতে লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, কয়লা এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বণ্টনমূলক মানচিত্রগুলো একের উপর এক রাখো। তোমরা কি এগুলোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক দেখতে পারছ - কেন ?

অ-লৌহবর্গীয় খনিজ (Non-Ferrous Minerals) : ভারতে অ-লৌহবর্গীয় খনিজ পদার্থের সঞ্চিত ভাণ্ডার এবং উৎপাদন সন্তোষজনক নয়। তথাপি এসব খনিজ যথা- তামা, বক্সাইট, সিসা, জিঙ্ক এবং স্বর্ণ যা ধাতব, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বৈদ্যুতিক শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চলো আমরা এখন তামা এবং বক্সাইট -এর বণ্টন সম্পর্কে অধ্যয়ন করি।

ভারত : লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট এবং অভ্রের বণ্টন

তামা (Copper) : ভারতে তামার সঞ্চয় এবং উৎপাদন যথেষ্ট কম। নমনীয়, প্রসারণশীল এবং তাপের সুপরিবাহী হওয়ায় তামা প্রধানত বৈদ্যুতিক তার, বৈদ্যুতিন এবং রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত

চিত্র 5.5 : মালঞ্জখণ্ড এর তামা খনি

হয়। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, রাজস্থানের ক্ষেত্রী এবং ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলার খনিগুলো তামার প্রধান উৎপাদক কেন্দ্র।

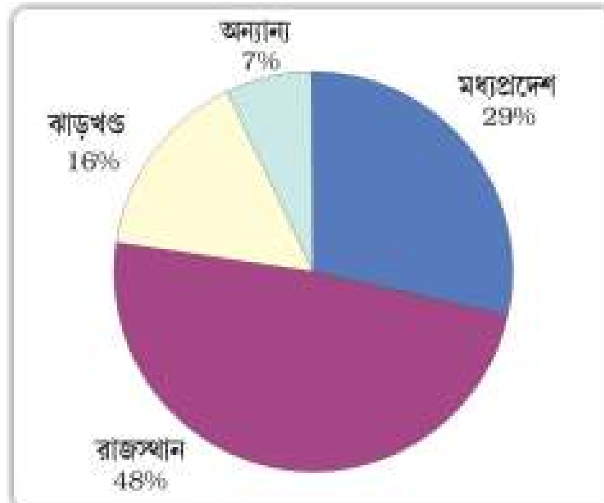

চিত্র 5.6 : তামা উৎপাদনে রাজ্যভিত্তিক অংশ (শতাংশে), 2009-10

বক্সাইট (Bauxite) : যদিও বহু আকরিকে অ্যালুমিনিয়াম থাকে, কিন্তু বক্সাইট থেকেই কর্দম সদৃশ পদার্থ থেকে অ্যালুমিনা এবং পরবর্তী সময়ে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। বক্সাইটের সঞ্চিত ভাণ্ডার অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট সমৃদ্ধ বহুবিধ শিলার বিয়োজনের ফলে সৃষ্টি হয়।

অ্যালুমিনিয়াম হল একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাতু, কেন না এটি লোহার মতো ধাতুর শক্তিযুক্ত করার, পাশাপাশি অত্যধিক হাল্কা, তাপের সুপরিবাহী এবং খুবই নমনীয় হয়।

ভারতে বক্সাইটের সঞ্চিত ভাণ্ডার প্রধানত পাওয়া যায় অমরকণ্টক মালভূমি, মৈকাল পাহাড় এবং বিলাসপুর- কাটনি মালভূমি অঞ্চলে।

চিত্র 5.7 : বক্সাইট খনি

ওড়িশা ভারতের বৃহত্তম বক্সাইট উৎপাদক রাজ্য, যেখানে 2009-10 সালে দেশের মোট উৎপাদনের 34.97 শতাংশ উৎপাদিত হয়। এখানকার কোরাপুট জেলার পঞ্চপাটমালির সঞ্চয় ভাণ্ডার হল রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্সাইটের ভাণ্ডার।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করো : ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্রে বক্সাইটের খনিগুলো চিহ্নিত করো।

মজাদার তথ্য

অ্যালুমিনিয়ামের আবিষ্কারের পর সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর পোশাকে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বোতাম এবং হুক লাগিয়ে পরিধান করতেন এবং নিজের বিশেষ অতিথিদের অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বাসনপত্রে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করতেন। তাছাড়া সাধারণ অতিথিদের স্বর্ণ ও রূপার তৈরি বাসনপত্রে ভোজন করাতেন। এই ঘটনার ত্রিশ বছর পর প্যারিসের ভিক্ষুকদের কাছে অ্যালুমিনিয়ামের বাটি থাকা এক সাধারণ ব্যাপার হয়ে পড়েছিল।

অধাতব খনিজ (Non-Metallic Minerals)

অভ্র (Mica) : অভ্র হচ্ছে এমন একটি খনিজ যা পাতের একটি সারি দ্বারা তৈরি হয়। এটি খুব সহজেই পাতলা পাত (Sheet) রূপে ভেঙে যায়। এই পাতগুলো এত পাতলা হতে পারে যে, এক হাজার অভ্রের পাত কয়েক সেমি উচ্চতা পর্যন্ত স্তরে স্তরে রাখা যেতে পারে। অভ্র স্বচ্ছ, কালো, সবুজ, লাল, হলুদ অথবা বাদামি বর্ণের হয়ে থাকে। এর বিদ্যুৎপ্রবাহের পৃথকীকরণে সর্বোচ্চ ক্ষমতা, শক্তি হ্রাসের নিম্ন ক্ষমতা, অপরিবাহিতার ধর্ম এবং উচ্চ ভোল্টেজের প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে অভ্র বিদ্যুৎ এবং বৈদ্যুতিক শিল্পে একটি অন্যতম অপরিহার্য খনিজ পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অভ্রের সঞ্চিত ভাণ্ডার ছোটোনাগপুর মালভূমির উত্তর প্রান্তে পাওয়া যায়। ঝাড়খণ্ডের কোডার্মা-গয়া-হাজারিবাগ বলয় সবচেয়ে বেশি অভ্র উত্তোলনকারী অঞ্চল।

রাজস্থানে অভ্র উৎপাদক অঞ্চল আজমেরের নিকটে অবস্থিত। অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর অভ্র বলয়ও দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভ্র উত্তোলনকারী বলয়।

খনিজ শিলা (Rock Minerals)

চুনাপাথর (Limestone) : চুনাপাথর ক্যালশিয়াম কার্বনেট অথবা ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট দ্বারা গঠিত শিলাসমূহ থেকে পাওয়া যায়। এটি ভূতাত্ত্বিক গঠনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাললিক শিলায় পাওয়া যায়। চুনাপাথর সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ধাতু গলানোর জন্য ব্যবহৃত চুল্লিতে লৌহ আকরিক গলানোর জন্য প্রয়োজন।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করো : মানচিত্রসমূহ অধ্যয়ন করো এবং ছোটোনাগপুর কেন 'খনিজ ভাণ্ডার' তা ব্যাখ্যা করো।

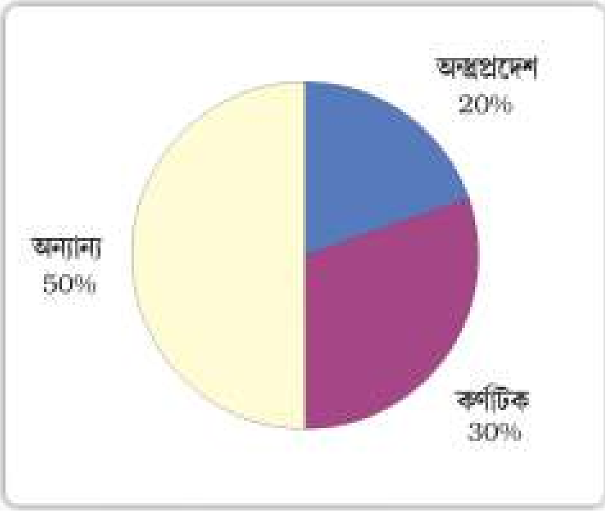

চিত্র 5.8 : চুনাপাথর উৎপাদনে রাজ্যভিত্তিক ভাগ (শতাংশে), 2009-10

খনি খননের ঝুঁকিসমূহ (Hazards of Mining)

তোমরা কি কখনও আমাদের জীবনকে আরামদায়ক বানানোর জন্য খননকারীরা যে চেষ্টা করে, সে সম্পর্কে ভেবেছ? খননকার্যের ফলে খননকারীদের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের ওপর কী প্রভাব পড়ে ?

খনির শ্রমিকদের ধুলো এবং অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে গ্রহণ করার ফলে ফুসফুস জনিত রোগের শিকার হয়ে পড়ে। খনির ছাদ ভেঙে যাওয়া, প্লাবনের জল ঢোকা এবং কয়লাখনিতে আগুন লাগা ইত্যাদি খনির শ্রমিকদের জন্য প্রতিনিয়ত আতঙ্কের বিষয়।

খননকার্যযুক্ত অঞ্চলের জলের উৎস দূষিত হয়ে পড়ে। বর্জ্যপদার্থ এবং কর্দম বা খনিজ তরল নিক্ষেপের ফলে ভূমি, মৃত্তিকা ক্ষয় হয় এবং জলস্রোত ও নদীর দূষণ বৃদ্ধি পায়।

চিত্র 5.9 : খননকার্যের এলাকায় ধোঁয়া সৃষ্টির কারণে বায়ু দূষণ

Jharia to be shifted

COAL FIRE CATASTROPHE

Coal unit fined Rs 300 cr in damages

'Over 50% of coal-belt mines unsafe'

Lav Kumar Mishra | TNN

Dhanbad: Three days after one of the worst mining disasters in decades left 54 people dead, the chief of the company which owns these mines, said no less than half the mines in the area did not meet the basic safety standards.

Bharat Coking Coal Ltd (BCCL) chairman Partho S Bhattacharya, however, said on Saturday the company shouldn't be blamed for operating unsafe mines because workers and trade unions had blocked moves to shut them for fear of losing jobs. He said only one out of 41 mines was operated scientifically and of the rest, the many were functioning against the advice of the Directorate General of Mines Safety. He described safety standards in 34 mines as poor.

Bhattacharya said workers were aware that they would have to seek voluntary retirement if unsafe mines were shut.

Bharat Coking Coal management on Saturday also handed over employment letters to the immediate people nominated by families of victims. Ironically, these people, most likely, would go to work in mines deemed unsafe by the company.

BCCL's audit of the safety status of mines, graded second and third degrees,

WAIT AND WATCH: A crowd watches the ongoing rescue operation outside the Bharat Coking Coal Ltd mine at Bhatdih in Jharkhand on Thursday

'Safety standards were not in place'

Lav Kumar Mishra | TNN

Dhanbad: Union coal minister Shibu Soren on Thursday announced an ex gratia of Rs 3 lakh to the families of the mine tragedy victims. Soren said: "Dependents of the victims will be provided employment by the Bharat Coking Coal from today. A probe by the director general of mines safety and the labour commissioner will also be initiated."

Soren also held discussions with Bharat Coking Coal officials and promised medical help to the four survivors.

tained, even though the director general of mine safety carries out surveys of the safety norms," an expert said.

Some agitating miners alleged that "there is no emergency measures inside the mine. We go deep — between 400 feet and 1,500 ft — into the mines with only an oxygen mask." The tragedy points to the lack of security measures by Bharat Coking Coal despite previous instances of disasters due to methane leak.

At least 48 people were killed in explosions in Jeetpur mine, 43 in Sudamdeeh and 38 in

খননকে 'ঘাতক শিল্প (Killer Industry)' থেকে বাঁচানোর জন্য কঠোর নিরাপত্তা বিধি এবং পরিবেশগত আইনের বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

খনিজের সংরক্ষণ (Conservation of Minerals)

আমরা সকলেই খনিজ ভাণ্ডারের ওপর শিল্প ও কৃষি এবং তাদের থেকে উৎপাদিত পদার্থের ওপর নির্ভরশীলতার মর্ম উপলব্ধি করি। কার্যকর খনিজ ভাণ্ডারের মোট পরিমাণ পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের মাত্র এক শতাংশ জুড়ে আছে যা খুবই তাৎপর্যহীন অর্থাৎ, যে খনিজ সম্পদগুলো সৃষ্টি হতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যায় আমরা সেগুলোকেই অতি দ্রুত হারে ব্যবহার করে চলেছি। খনিজ গঠনের ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলো অত্যন্ত ধীর, যা বর্তমান ব্যবহারের মাত্রার তুলনায় এর পরিপূরণের মাত্রা খুবই কম। তাই খনিজ সম্পদ সীমাবদ্ধ এবং অনবীকরণযোগ্য। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ভাণ্ডারসমূহ আমাদের দেশের মূল্যবান, কিন্তু স্বল্পকালীন সম্পদ। ক্রমাগত আকরিকের উত্তোলন অর্থব্যয় বৃদ্ধি করে, কারণ খনিজ উত্তোলন যতই গভীরতর হয় ততই এর গুণমান হ্রাস পায়।

খনিজ সম্পদগুলোকে পরিকল্পনাগত এবং স্থিতিশীল উপায়ে ব্যবহার করার জন্য আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা করতে হবে। নিম্নমানের আকরিকগুলোকে কম খরচে ব্যবহার করার জন্য উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা ক্রমাগত সৃষ্টি করতে হবে। খনিজ সম্পদসমূহকে ভবিষ্যতের জন্য

ব্যবহার করার কয়েকটি উপায় হচ্ছে ধাতুর পুনর্ব্যবহার, ধাতুর অংশ বিশেষ (Scrap Metals) এবং অন্যান্য বিকল্প পদার্থ ব্যবহার করা।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করো :

এমন পদার্থসমূহের তালিকা প্রস্তুত করো যেখানে খনিজের পরিবর্তে খনিজের বিকল্প পদার্থসমূহ ব্যবহৃত হয়। এসকল বিকল্প পদার্থ কোথা থেকে পাওয়া যায় ?

শক্তি সম্পদসমূহ (Energy Resources)

সকল প্রকার কাজের জন্য শক্তির প্রয়োজন। এটি রান্না করতে, আলো ও তাপ সরবরাহ করার জন্য, যানবাহন চালানোর জন্য এবং শিল্পগুলোতে যন্ত্রাংশ সচল রাখার জন্য প্রয়োজন।

কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইউরেনিয়াম এবং বিদ্যুৎ ইত্যাদি জ্বালানি খনিজ পদার্থ থেকে শক্তি উৎপন্ন করা যেতে পারে। শক্তি সম্পদসমূহকে প্রচলিত বা চিরাচরিত শক্তি এবং অপ্রচলিত বা অচিরাচরিত শক্তি সম্পদে ভাগ করা যেতে পারে। প্রচলিত শক্তির মধ্যে জ্বালানি কাঠ, গবাদি পশুর গোবর, কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বিদ্যুৎ শক্তি (জলবিদ্যুৎ এবং তাপবিদ্যুৎ) অন্তর্ভুক্ত। অপ্রচলিত শক্তির অন্তর্গত হল সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জোয়ারভাটা, ভূতাপশক্তি, জৈবগ্যাস এবং পারমাণবিক শক্তি ইত্যাদি। গ্রামীণ ভারতে জ্বালানি কাঠ এবং গবাদি পশুর গোবর বা ঘুঁটে হচ্ছে খুবই সাধারণ প্রাপ্য সম্পদ। একটি হিসাব অনুযায়ী গ্রামের বাড়িঘরের শক্তির মোট চাহিদার 70 শতাংশেরও বেশি এই দু-প্রকার শক্তির উৎস থেকে প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বনভূমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ার ফলে এই দুই শক্তির উৎসের ব্যবহার কষ্টকর হয়ে পড়েছে। সর্বোপরি, ঘুঁটের ব্যবহারও ক্রমাগত কম করে দেওয়া হচ্ছে, কারণ এটি কৃষিকার্যে মূল্যবান সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রচলিত বা চিরাচরিত শক্তির উৎস (Conventional Sources of Energy) :

কয়লা (Coal) : ভারতে কয়লা হল সবচেয়ে অধিক পরিমাণে সহজলভ্য জীবাশ্ম জ্বালানি। দেশের মোট শক্তি চাহিদার এক উল্লেখযোগ্য অংশ কয়লা থেকে আসে। এটি বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্পে শক্তি সরবরাহ এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয়তা মেটাতেও ব্যবহৃত হয়। ভারত বাণিজ্যিক শক্তির চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রধানত কয়লার ওপর নির্ভরশীল।

তোমরা পূর্বেই জেনেছ যে, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে উদ্ভিদ মাটির নীচে চাপা পড়ায় কয়লার সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্য সঙ্কোচনের মাত্রা এবং গভীরতা ও চাপা পড়ার সময়ের ভিত্তিতে কয়লা বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। জলাভূমিতে উদ্ভিদের পচনের ফলে পিট সৃষ্টি হয়।

চিত্র 5.10 (a) : একটি কয়লা খনির অভ্যন্তরীণ দৃশ্য

চিত্র 5.10 (b) : একটি কয়লা খনির বাইরের দৃশ্য

এতে কার্বনের পরিমাণ কম, উচ্চ আর্দ্রতা যুক্ত হয় এবং তাপগ্রহণ করার ক্ষমতা কম থাকে। **লিগনাইট** হল এক নিম্নমানের বাদামি কয়লা, যা নরম হয় এবং এতে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকে। লিগনাইট এর প্রধান ভাণ্ডার তামিলনাড়ুর নেভেলিতে বিদ্যমান এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। যে কয়লা অনেক গভীরে প্রোথিত বা চাপা পড়ে আছে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে তাকে **বিটুমিনাস** কয়লা বলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যবহারের দিক থেকে এটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় কয়লা। ধাতব শিল্পের কয়লা হল উচ্চমানের বিটুমিনাস কয়লা যা বিশেষত ধাতু গলানোর চুল্লিতে অর্থাৎ মারুৎ চুল্লিতে লোহা গলানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। **অ্যানথ্রেসাইট** হল সবচেয়ে উচ্চমানের শক্ত কয়লা।

ভারতে কয়লা ভূতাত্ত্বিক যুগের শিলায় প্রধানত দুটি ক্রমে পাওয়া যায়। প্রথমটি হচ্ছে গণ্ডোয়ানা (Ganduana), যা 200 মিলিয়ন বছরের অধিক প্রাচীন এবং অপরটি হচ্ছে টার্শিয়ারি (Tartiary) যা 55 মিলিয়ন বছর প্রাচীন। গণ্ডোয়ানা কয়লা যা ধাতব শিল্প কয়লা নামেও পরিচিত।

ভারত : কয়লা, খনিজতেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বণ্টন।

এর মূখ্য ভান্ডারগুলো দামোদর উপত্যকায় (পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ড) অবস্থিত। ঝরিয়া, রানিগঞ্জ, বোকারো হল গুরুত্বপূর্ণ কয়লাখনি। গোদাবরী, মহানদী, শোণ এবং ওয়ার্ধা উপত্যকায়ও কয়লার ভাণ্ডার মজুত রয়েছে।

টার্শিয়ারি যুগের কয়লা পাওয়া যায় উত্তর-পূর্ব রাজ্যসমূহে যথা- মেঘালয়, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ড-এ।

মনে রাখবে যে, কয়লা হল একটি ভারী পদার্থ, যা ব্যবহার করার পর এর ওজন হ্রাস পায়, কারণ এটি ছাই বা ভস্মে রূপান্তরিত হয়। এ কারণে ভারী শিল্প এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ কয়লা খনির কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত।

খনিজ তেল (Petroleum) : ভারতে পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল হল কয়লার পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শক্তি সম্পদ। এটি তাপ এবং আলো জ্বালানোর জন্য জ্বালানি, মেশিনের জন্য তেল এবং বহু সংখ্যক উৎপাদনমূলক শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ করে। খনিজ তেল শোধনাগারগুলো কৃত্রিম বস্ত্র (Synthetic Textile), সার এবং বিবিধ রাসায়নিক শিল্পে 'সংযোগকারী শিল্প (Nodal Industry)' হিসাবে কাজ করে।

ভারতে অধিকাংশ খনিজ তেলের উপস্থিতি টার্শিয়ারি যুগের শিলার উর্ধ্বভঙ্গ এবং চ্যুতি রেখায় পাওয়া যায়। ভাঁজযুক্ত উর্ধ্বভঙ্গ বা গম্বুজযুক্ত অঞ্চলে খনিজতেল উর্ধ্বভাঁজের শীর্ষে পাওয়া যায় যেখানে এটি আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। খনিজতেল ধারক স্তর সচ্ছিদ্র চুনাপাথর অথবা বেলে পাথরের হয়, যার মাধ্যমে তেল প্রবাহিত হতে পারে। মধ্যবর্তী অসচ্ছিদ্রতাযুক্ত স্তরটি খনিজ তেলকে উপরে উঠতে অথবা নিমজ্জনের হাত থেকে রক্ষা করে।

সচ্ছিদ্র এবং অসচ্ছিদ্রতাযুক্ত শিলার মধ্যেকার চ্যুতিতলেও খনিজ তেল পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস হালকা হওয়ায় খনিজ তেলের উপরে অবস্থান করে।

ভারতের খনিজ তেল উত্তোলনের শতকরা প্রায় 63 ভাগ মুম্বাই-হাই, 18 ভাগ গুজরাট এবং 16 ভাগ আসাম থেকে উত্তোলিত হয়। মানচিত্রে পশ্চিম ভারতের তিনটি প্রধান সমুদ্র তীরবর্তী তৈলক্ষেত্র চিহ্নিত করো। আঙ্কেলেশ্বর হচ্ছে গুজরাটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তৈলক্ষেত্র। আসাম হল ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন তেল উৎপাদনকারী রাজ্য। ডিগবয়, নাহারকাটিয়া এবং মোরান-হুজরিজান হল এই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ তৈলক্ষেত্রসমূহ।

প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas) : প্রাকৃতিক গ্যাস হল একটি অত্যাবশ্যকীয় শুদ্ধ শক্তির উৎস যা খনিজতেলের সাথে বা খনিজ তেল ব্যতীতও পাওয়া যায়। এটি শক্তির উৎস হিসাবে এবং পেট্রোরাসায়নিক শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের কম নির্গমনের কারণে প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবেশ অনুকূল জ্বালানি হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এজন্যই এটি বর্তমান শতাব্দীর জ্বালানি।

প্রাকৃতিক গ্যাসের বিশাল ভাণ্ডার কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। পশ্চিম উপকূল বরাবর মুম্বাই-হাই এবং তৎসংলগ্ন ক্ষেত্রের অভাব কাম্বে উপসাগরে প্রাপ্ত তেল দ্বারা পূরণ করে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপুঞ্জ হল প্রাকৃতিক গ্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

1700 কিমি দীর্ঘ হাজিরা - বিজয়পুর - জগদীশপুর ক্রস কান্ট্রি (Cross Country) গ্যাস পাইপলাইন মুম্বাই-হাই এবং বাসিনকে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের সার, বিদ্যুৎ ও শিল্পক্ষেত্রগুলোর সাথে যুক্ত করে। এটি ভারতের গ্যাস উৎপাদনকে গতি প্রদান করেছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান ব্যবহারকারী হল বিদ্যুৎ এবং সার শিল্প। যানবাহনের জন্য তরল জ্বালানির পরিবর্তে সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (Compressed Natural Gas) সংক্ষেপে CNG এর ব্যবহার দেশে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

বিদ্যুৎ শক্তি (Electricity) : বর্তমান বিশ্বে বিদ্যুৎ শক্তির এত বিশাল প্রয়োগ হচ্ছে যে, এর মাথাপিছু ব্যবহারকে বিকাশের এক সূচক হিসাবে ধরা হয়। বিদ্যুৎ প্রধানত দুটি উপায়ে সৃষ্টি হয় - প্রবাহিত জল থেকে যা জলের দ্বারা টারবাইনগুলোকে চালিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করে, এবং অন্যান্য জ্বালানি, যেমন- কয়লা, খনিজতেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস দহন করে টারবাইনগুলোকে চালিয়ে তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। একবার উৎপন্ন হয়ে গেলে বিদ্যুৎ একইরকম থাকে।

কিছু নদী উপত্যকা প্রকল্প এবং এই নদীগুলোর উপর তৈরি বাঁধগুলোর নাম লেখো।

জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় দ্রুত প্রবাহিত জল দ্বারা, যা হল একটি নবীকরণযোগ্য সম্পদ। ভারতে বহু সংখ্যক বহুমুখী প্রকল্প রয়েছে যেগুলো থেকে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হয়। যথা- ভাকরা নাঙ্গাল, দামোদর উপত্যকা নিগম, কোপিলি জল প্রকল্প ইত্যাদি।

তাপবিদ্যুৎ কয়লা, খনিজতেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে উৎপাদন করা হয়। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অনবীকরণযোগ্য জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে। ভারতে 310 এর অধিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে।

ভারত : পারমাণবিক এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের বণ্টন

তোমাদের রাজ্যে তাপবিদ্যুৎ/জলবিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্পগুলো শনাক্ত করো। এগুলোকে ভারতের মানচিত্রে দর্শাও।

অপ্রচলিত বা অচিরাচরিত শক্তির উৎস (Non-Conventional Sources of Energy)

শক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার দেশকে কয়লা, খনিজ তেল এবং গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল করে দিয়েছে। তেল এবং গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি এবং তাদের সম্ভাব্য ঘাটতি ভবিষ্যতে শক্তি সরবরাহের সুরক্ষার অনিশ্চিয়তা বৃদ্ধি করছে। ফলে জাতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধিতে এর গভীর প্রভাব পড়ছে। সর্বোপরি, জীবাশ্ম জ্বালানির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার গুরুতর পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই নবীকরণযোগ্য সম্পদ যেমন সৌরশক্তি, বায়ু, জোয়ারভাটা, জৈব গ্যাস এবং বর্জ্য পদার্থ থেকে উৎপন্ন শক্তির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এগুলোকে অপ্রচলিত বা অচিরাচরিত শক্তির উৎস বলা হয়।

ভারতে সূর্যালোক, জল, বায়ু এবং জৈবসারের প্রতুলতা রয়েছে। এসকল নবীকরণযোগ্য সম্পদের বিকাশের জন্য বিশাল কার্যকলাপও নেওয়া হচ্ছে।

পারমাণবিক বা আণবিক শক্তি (Nuclear or Atomic Energy) এটি পরমাণুর গঠন পরিবর্তন করে পাওয়া যায়। যখন এরকম পরিবর্তন করা হয়, তখন তাপ রূপে প্রচুর শক্তির নির্গমন ঘটে এবং এটি বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। ঝাড়খণ্ড এবং রাজস্থানের আরাবল্লি পর্বতে প্রাপ্ত ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম আণবিক অথবা পারমাণবিক শক্তি উৎপন্ন করতে ব্যবহার করা হয়। কেরালার মোনাজাইট বালিও থোরিয়াম-এ সমৃদ্ধ।

ছটি পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র চিহ্নিত করো এবং এগুলো কোন্ কোন্ রাজ্যে অবস্থিত তা শনাক্ত করো।

সৌরশক্তি (Solar Energy)

ভারত ক্রান্তীয় জলবায়ুর দেশ। এই দেশে সৌরশক্তি ব্যবহারের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। ফোটোভোল্টাইক (Photovoltaic) প্রযুক্তি সূর্যালোককে সরাসরি বিদ্যুতে পরিবর্তিত করে। গ্রামীণ ও সুদূর এলাকায় সৌরশক্তি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু সংখ্যক বড়ো সৌরশক্তি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যা গ্রামের গৃহস্থালির জ্বালানি কাঠ এবং ঘুঁটের ওপর নির্ভরশীলতা অনেকটা কমবে, পরিবেশ সংরক্ষণে এবং কৃষিকার্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ সারের সরবরাহে সাহায্য করবে।

চিত্র 5.11 : সৌরশক্তি চালিত বৈদ্যুতিক দুগ্ধ পরীক্ষণ যন্ত্র

কাজ

ভারতে সদ্য স্থাপিত সৌরশক্তি কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।

বায়ুশক্তি (Wind Power)

ভারতে বায়ু শক্তির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। সবচেয়ে বিশালতম বায়ুশক্তি অঞ্চল তামিলনাড়ুতে নাগেরকয়েল থেকে মাদুরাই পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, গুজরাট, কেরালা, মহারাষ্ট্র এবং লাক্ষাদ্বীপে গুরুত্বপূর্ণ বায়ু ফার্ম আছে। নাগেরকয়েল এবং জয়সলমির দেশের বায়ুশক্তির কার্যকর ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত।

চিত্র 5.12 : বায়ুকল (Wind mills) - নাগেরকয়েল

জৈব গ্যাস (Biogas)

গ্রাম্য এলাকায় গুল্ম, কৃষি বর্জ্য, পশু এবং মানবের বর্জ্যপদার্থ থেকে জৈবগ্যাস উৎপন্ন করে গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করা হয়। জৈব পদার্থের বিয়োজনের ফলে জৈব গ্যাস উৎপন্ন হয়, যার তাপীয় সক্ষমতা বা দক্ষতা কেরোসিন তেল, ঘুঁটে এবং চারকোল অপেক্ষা বেশি হয়। জৈবগ্যাস প্ল্যান্ট পৌর, সমবায় সমিতি এবং ব্যক্তিগত স্তরে স্থাপন করা হয়। গ্রামীণ ভারতের গোবর ব্যবহারকারী প্ল্যান্টগুলো "গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট" নামে পরিচিত। এগুলো শক্তি এবং উন্নত মানের সার সরবরাহ করে কৃষকদের দু'দিকে লাভ প্রদান করে। জৈব গ্যাসে গবাদি পশুর গোবর অধিকতম দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা হয়। এটি সারের

গুণমান উন্নত করে এবং ঘুঁটে বা গোবর তথা জ্বালানি কাঠের দহন থেকে গাছের ধ্বংস প্রতিরোধ করে।

চিত্র 5.13 : জৈবগ্যাস প্ল্যান্ট (Biogas Plant)

জোয়ারভাটা শক্তি (Tidal Energy)

মহাসাগরীয় জোয়ারভাটা বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্ষুদ্র উপসাগরে জলনির্গমনের পথযুক্ত বাঁধ তৈরি করা হয়। জোয়ারের সময় জল উপসাগরে প্রবেশ করে এবং যখন বাঁধের দরজা বন্ধ হয় তখন জল আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বাঁধের দরজার বাইরে ভাটার সময় অর্থাৎ যখন জোয়ারের জল নেমে যায়, তখন বাঁধের পশ্চাতের জল একটি পাইপের মাধ্যমে সমুদ্রের দিকে আবার ফিরে যায় যা একটি শক্তি উৎপাদক টারবাইন এর মধ্য দিয়ে বাহিত হয়।

ভারতে খাম্বাত উপসাগর, গুজরাটের পশ্চিম উপকূলের কচ্ছ উপসাগর এবং পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন উপকূলের গাঙ্গেয় দ্বীপ জোয়ারভাটা শক্তি ব্যবহারের জন্য আদর্শ পরিস্থিতি প্রদান করে।

ভূতাপ শক্তি (Geo-Thermal Energy)

ভূতাপ শক্তি বলতে বোঝায় পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ থেকে সৃষ্ট শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাপ এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা। ভূতাপীয় শক্তি বিদ্যমান থাকে, কারণ গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে পৃথিবীর অভ্যন্তরে ক্রমাগত উত্তাপ বাড়তে থাকে। যেখানে ভূতাপীয় শক্তির পরিমাণ বেশি থাকে, সেখানে অগভীর স্থানেও অধিক তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। এরূপ স্থানে ভূগর্ভস্থ জল শিলা থেকে তাপ শোষণ করে এবং উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। এটি এতই উত্তপ্ত হয়ে পরে যে, যখন এটি ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায়, তখন তা বাস্পে পরিণত হয়। এই বাস্প টারবাইন চালাতে এবং বিদ্যুৎ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

ভারতে শতাধিক উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে, যা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ভূতাপীয় শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য ভারতে পরীক্ষামূলকভাবে দুটি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। একটি হিমাচল প্রদেশের মনিকর্ণের নিকটে পার্বতী উপত্যকায় এবং অপরটি লাডাক এর পুগা উপত্যকায় অবস্থিত।

শক্তি সম্পদের সংরক্ষণ

(Conservation of Energy Resources)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মৌলিক উপাদান হল শক্তি, জাতীয় অর্থনীতির প্রত্যেক ক্ষেত্র যথা- কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, বাণিজ্য এবং গৃহস্থালি ইত্যাদি সবগুলোতেই শক্তির প্রয়োজন হয়। স্বাধীনতার পর কার্যকরী অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলোকে সার্থক করার জন্য শক্তির পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করার প্রয়োজন ছিল। ফলস্বরূপ দেশে শক্তির বিভিন্ন রূপের ব্যবহার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই পটভূমিতে, শক্তি বিকাশের এক স্থিতিশীল পথ খুঁজে বের করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। শক্তি সংরক্ষণের উন্নয়ন এবং নবীকরণযোগ্য সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি করা হল স্থিতিশীল শক্তির দুটো উপায়।

বর্তমানে ভারত বিশ্বের একটি ন্যূনতম শক্তিদক্ষ দেশ। আমাদের শক্তির সীমিত সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের জন্য যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে আমরা যাতায়াতের জন্য ব্যক্তিগত যানবাহনের পরিবর্তে সর্বজনীন যানবাহনের ব্যবহার করা, যখন ব্যবহার হচ্ছে না তখন বিদ্যুৎ বন্ধ রাখা, শক্তি সঞ্চয়কারী উপকরণ ব্যবহার করা এবং অপ্রচলিত শক্তির উৎস ব্যবহার করে আমরা আমাদের স্বল্প যোগদান দিতে পারি। সর্বোপরি, "শক্তি সংরক্ষণই হল শক্তি উৎপাদন।"

অনুশীলনী অনুশীলনী অনুশীলনী অনুশীলনী অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :

i) নিম্নলিখিত খনিজ পদার্থগুলোর মধ্যে কোন্‌টি শিলার বিয়োজনের ফলে সৃষ্ট হয় যা আবহবিকারজাত পদার্থের অবশিষ্টাংশ রূপে পড়ে থাকে ?

a) কয়লা b) বক্সাইট c) স্বর্ণ d) জিঙ্ক

ii) ঝাড়খণ্ডের কোডার্মা নিম্নলিখিত কোন্ খনিজ পদার্থের অগ্রণী উৎপাদক ?

a) বক্সাইট b) অভ্র c) লৌহ আকরিক d) তামা

iii) নিম্নলিখিত শিলাগুলোর মধ্যে কোন্‌টিতে খনিজ পদার্থ স্তরে স্তরে সঞ্চিত এবং পুঞ্জীভূত থাকে ?

a) পাললিক শিলা b) আগ্নেয় শিলা c) রূপান্তরিত শিলা d) উপরের কোনোটাই নয়।

iv) মোনাজাইট বালিতে নিম্নলিখিত খনিজ পদার্থের কোন্‌টি পাওয়া যায় ?

a) খনিজ তেল b) ইউরেনিয়াম c) থোরিয়াম d) কয়লা

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

i) নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর পার্থক্য 30 টি শব্দের মধ্যে লেখো।

a) লৌহবর্গীয় এবং অ-লৌহবর্গীয় খনিজ পদার্থ।

b) প্রচলিত এবং অপ্রচলিত শক্তির উৎস।

ii) খনিজ কী ?

iii) আগ্নেয় এবং রূপান্তরিত শিলায় খনিজ পদার্থ কীভাবে গঠিত হয় ?

iv) আমাদের খনিজ সম্পদের সংরক্ষণ প্রয়োজন কেন ?

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 120 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

i) ভারতে কয়লার বণ্টন বর্ণনা করো।

ii) তোমাদের কেন মনে হয় যে, ভারতে সৌরশক্তির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে ?

কাজ : নিম্নে দেওয়া শব্দের ধাঁধাতে সঠিক খনিজ পদার্থের নাম লেখো। *[নোট : ধাঁধার উত্তর ইংরেজি শব্দে দেওয়া আছে।]*

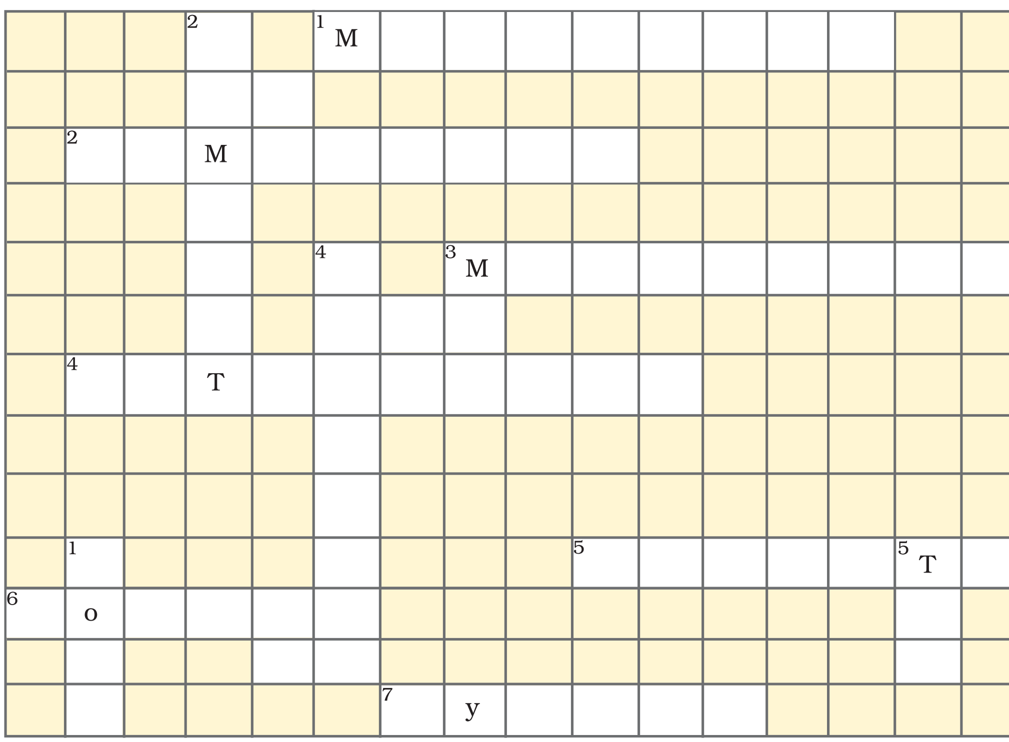

পাশাপাশি

1) একটি লৌহবর্গীয় খনিজ (9)
2) সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল (9)
3) চৌম্বকীয় গুণাবলিযুক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহ আকরিক (9)
4) উৎকৃষ্ট কঠিন কয়লা (10)
5) এই আকরিক থেকে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায় (7)
6) ক্ষেত্রী খনি এই খনিজের জন্য বিখ্যাত (6)
7) বাষ্পীভবনের কারণে সৃষ্ট (6)

উপর-নীচ

1) প্লেসার সঞ্চয়ে পাওয়া যায় (4)
2) বাইলাডিলায় খনন করা লৌহ আকরিক (8)
3) বৈদ্যুতিক শিল্পের জন্য অপরিহার্য (4)
4) উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রাপ্ত কয়লার ভূতাত্ত্বিক সময় (8)
5) শিরা এবং খাতে সৃষ্ট (3)

শ্রমশিল্প

MANUFACTURING INDUSTRIES

6

দীপাবলি উৎসবের দিন, হরিশ পিতা-মাতার সাথে বাজারে গিয়েছিল। তার পিতা-মাতা তার জন্য জুতো ও কাপড় এবং মা বাসনপত্র, চিনি, চা-পাতা ও মাটির প্রদীপ কিনেছিল। হরিশ লক্ষ করল যে, বিক্রয়ের জন্য বাজারের দোকানগুলো অধিকমাত্রায় বিভিন্ন দ্রব্য দিয়ে সাজানো রয়েছে। সে অবাক হয় যে, কীভাবে এত দ্রব্য বিপুল পরিমাণে তৈরি হতে পারে। তার পিতা তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, জুতো, কাপড়, চিনি, ইত্যাদি তৈরি হয় বড়ো কারখানাগুলোতে এবং বাসনপত্র তৈরি হয় আরও ছোটো কারখানায়। আবার মাটির প্রদীপের মতো বস্তু ব্যক্তিগতভাবে কারিগর দিয়ে কুটিরশিল্প কারখানায় তৈরি করা হয়।

তোমাদের এই শিল্প কারখানাগুলোর সম্বন্ধে কি কোনো ধারণা আছে ?

কাঁচামালকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে অধিক উপযোগী ও মূল্যবান দ্রব্যে রূপান্তরিত করে বিশাল পরিমাণের দ্রব্য উৎপাদনকে **শ্রমশিল্প** বলা হয়। তোমরা কি জান যে, কাঠ থেকে কাগজ, আখ থেকে চিনি, আকরিক লোহা থেকে লৌহ ও ইস্পাত এবং বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করা হয় ? তোমরা কি এটাও জান যে, বিভিন্ন ধরনের কাপড় তৈরি হয় সুতো থেকে যা নিজেই একটি শিল্পদ্রব্য ?

দ্বিতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত ব্যক্তি প্রাথমিক দ্রব্যকে পরিবর্তন করে উপযোগী বস্তু তৈরি করে। ইস্পাত কারখানা, গাড়ি নির্মাণ কারখানা, তরল পানীয় উৎপাদন কারখানা, কাপড় তৈরির কারখানা, বেকারি, প্রভৃতিতে নিযুক্ত কর্মীরা এই শ্রেণির অন্তর্গত। কিছু ব্যক্তি সেবা প্রদানের কাজে নিযুক্ত হয়। এই অধ্যায়ে আমরা প্রধানত দ্বিতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপের অন্তর্গত শ্রমশিল্পের বিষয় নিয়েই জানব।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি শ্রমশিল্পের উন্নতি দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

শ্রমশিল্পের গুরুত্ব (Importance of Manufacturing)

শ্রমশিল্পকে সার্বিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির মেরুদণ্ড রূপে গণ্য করা হয়। কারণ—

- শ্রমশিল্প শুধুমাত্র কৃষির আধুনিকীকরণে সাহায্য করে না, বরং আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড গঠন করে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে চাকুরির ব্যবস্থা করে কৃষিভিত্তিক আয়ের ওপর আমাদের অধিক নির্ভরতাও কমিয়ে আনে।
- দেশের বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূরীকরণে শিল্পের বিকাশ একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত। ভারতের সরকারি উদ্যোগ এবং যৌথ উদ্যোগ ক্ষেত্রের পশ্চাতে এটাই ছিল মূল দর্শন। জনজাতি ও পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক অসমতাকে কমিয়ে আনা।
- নির্মিত দ্রব্যের রপ্তানি, ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তার ঘটায় এবং প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আসে।
- যে সকল দেশ তাদের কাঁচামালকে বিভিন্ন ধরনের উচ্চমূল্যের দ্রব্যে রূপান্তর করে থাকে, সে সকল দেশই সৌভাগ্যশালী হয়। যত দ্রুত সম্ভব বিভিন্ন নির্মাণ শিল্পের বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণের মধ্য দিয়েই ভারতের বিকাশ সম্ভব।

কৃষি ও শিল্প একে অপর থেকে পৃথক নয়। এরা একে অপরের হাত ধরাধরি করে চলে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে কৃষিভিত্তিক শিল্প কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অনেক উৎসাহ প্রদান করে। এই শিল্পগুলো পরবর্তী সময়ে কৃষিজ কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে এবং তাদের শিল্পজাত দ্রব্য যেমন, জলসেচন পাম্প, সার, জীবাণুনাশক, কীটনাশক, প্লাস্টিক ও পিভিসি পাইপ, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রভৃতি কৃষকদের কাছে বিক্রয় করে। এভাবে, শ্রমশিল্পের উন্নতি ও প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে তা নয়, বরং উৎপাদন প্রক্রিয়াকেও ভীষণ দক্ষ বানিয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে আমাদের শিল্পোদ্যোগ আরও অধিক দক্ষ ও প্রতিযোগী হওয়া আবশ্যক, শুধুমাত্র আত্মনির্ভরতাই যথেষ্ট নয়। আমাদের উৎপাদিত পণ্য অবশ্যই গুণগতভাবে আন্তর্জাতিক

বাজারের উপযোগী হতে হবে, তাহলেই আমরা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হব।

জাতীয় অর্থব্যবস্থায় শিল্পের অবদান (Contribution of Industry to National Economy)

গত দুই দশকে শ্রমশিল্প মোট দেশীয় উৎপাদনের 27 শতাংশের মধ্যে 17 শতাংশে স্থির হয়েছে এবং বাকি 10 শতাংশ খনিজ খনন, খাত খনন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত।

পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশে মোট দেশীয় উৎপাদন শতকরা 25 থেকে 35 ভাগ। সেই তুলনায় ভারতে অনেকটাই কম। শেষ দশকে ভারতীয় শিল্পে প্রতি বছরে 7 শতাংশ হারে বৃদ্ধি ঘটেছে। পরবর্তী দশকে প্রত্যাশিত বৃদ্ধির হার হল 12 শতাংশ। 2003 সাল থেকে শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার প্রতি বছরে 9 থেকে 10 শতাংশ। সরকারের উপযুক্ত নীতি প্রয়োগ এবং শিল্পোদ্যোগের আপ্রাণ চেষ্টায় উৎপাদন বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতিকে লক্ষ করে অর্থনীতিবিদরা অনুমান করেন যে, পরবর্তী দশকে শ্রমশিল্প তার লক্ষ্য পূরণে সফলতা অর্জন করতে পারবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে "জাতীয় শিল্প প্রতিযোগিতা পর্ষদ (National Manufacturing Competitiveness Council) [NMCC]" স্থাপন করা হয়।

শিল্পের অবস্থান (Industrial Location)

শিল্পের অবস্থানের প্রকৃতি নির্ণয় করা স্বাভাবিকভাবে জটিল। কাঁচামালের প্রাচুর্য, শ্রমিক, মূলধন, শক্তি লাভের সুবিধা ও বাজারের উপস্থিতি প্রভৃতি শিল্প স্থাপনকে প্রভাবিত করে। এসব উপাদান একই স্থানে প্রচুর পরিমাণে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। ফলস্বরূপ উৎপাদন কার্যকলাপের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান নির্ণয়ের প্রবণতা থাকে, যেখানে শিল্পের সমস্ত কারণগুলো উপলব্ধ থাকে বা কম খরচে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিল্প স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে নবীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। কখনো-কখনো শিল্পকেন্দ্র বাইরে কিংবা শহরের নিকটে স্থাপন করা হয়। অতএব বলা যেতে পারে যে, শিল্পায়ন ও নগরায়ণ অঙ্গাঙ্গিভাবে চলে। শিল্পের জন্য শহর, বাজার ও পরিসেবা প্রদান করে যেমন ব্যাংকিং, বিমা, পরিবহণ, শ্রমিক, পেশাদার উপদেষ্টা এবং অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা ইত্যাদি। নগরের পরিসেবা কেন্দ্রগুলো দ্বারা প্রদত্ত সুবিধাগুলো থেকে লাভ নেওয়ার জন্য অনেক শিল্পকারখানা নগরের আশেপাশে কেন্দ্রীভূত হয়। এটি **"পুঞ্জীভূত অর্থনীতি (Agglomeration Economics)"** নামে পরিচিত। এসব স্থানে ধীরে ধীরে বিশাল শিল্পসমূহের একত্রীকরণ সংগঠিত হয়।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে দেশের অধিকাংশ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই প্রভৃতি শহর থেকে দূরবর্তী স্থানে গড়ে উঠেছিল। পরিণামে এক বিশাল গ্রামীণ কৃষি পশ্চাদভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত কিছু স্থান শিল্পোন্নত শহরকেন্দ্র রূপে উত্থিত হয়।

শিল্প - বাজার সম্বন্ধীয়
(Industry - Market linkage)

চিত্র : 6.1

কোনো শিল্প কারখানার অবস্থান নির্ণয়ের মূল চাবিকাঠি হল ন্যূনতম ব্যয়। সরকারের নীতিসমূহ এবং দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতাও শিল্প স্থাপনকে প্রভাবিত করে।

শিল্পের আদর্শ স্থান
(Ideal Location of an Industry)

চিত্র : 6.2

শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
(Classification of Industries)

দৈনন্দিন জীবনে তোমাদের ব্যবহৃত বস্তু যেমন- রেডিয়ো, বৈদ্যুতিক বাল্ব, বনস্পতি তেল, সিমেন্ট, কাচের সামগ্রী, পেট্রোল, দিয়াশলাই, স্কুটার, মোটরগাড়ি, ঔষধ এবং আরও এ ধরনের বিভিন্ন উৎপাদিত দ্রব্যের তালিকা তৈরি করো। যদি আমরা বিশেষ মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিভিন্ন শিল্পকে শ্রেণিবিভক্ত করি, তাহলে আমরাও শিল্পের ধরন সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হব। শিল্পকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিভক্ত করা যেতে পারে :

ব্যবহৃত কাঁচামালের উৎসের ওপর ভিত্তি করে :

- *কৃষিভিত্তিক (Agro based) :* সুতিবস্ত্র, পশমবস্ত্র, পাটজাত দ্রব্য, রেশমবস্ত্র, রবার, চিনি, চা, কফি, ভোজ্যতেল শিল্প।
- *খনিজভিত্তিক (Mineral based) :* লৌহ ও ইস্পাত, সিমেন্ট, অ্যালুমিনিয়াম, যন্ত্রপাতি, পেট্রোরসায়ন শিল্প।

শিল্পের মুখ্য ভূমিকা অনুসারে :

- *মূল শিল্প (Basic or Key Industries) :* যে শিল্পগুলোর উৎপাদিত দ্রব্য অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুতিতে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- লৌহ ও ইস্পাত এবং তামার বিগলন, অ্যালুমিনিয়াম বিগলন শিল্প।
- *ভোক্তাসাধন শিল্প (Consumer Industries) :* যে শিল্পগুলোর উৎপাদিত দ্রব্য ভোক্তারা সরাসরি ব্যবহার করে। যেমন- চিনি, টুথপেস্ট, কাগজ, সেলাই মেশিন, পাখা ইত্যাদি।

মূলধন বিনিয়োগের ভিত্তিতে :

- একটি ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পকে একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির ওপর সর্বাধিক বিনিয়োগের পরিপেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই বিনিয়োগের পরিমাণ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হতে থাকে। বর্তমানে সর্বাধিক এক কোটি টাকা বিনিয়োগের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। যদি কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের পরিমাণ এক কোটি টাকার অধিক হয়, তাহলে ওই শিল্পকে বৃহদায়তনের শিল্প বলে গণ্য করা হবে।

মালিকানা ভিত্তিতে :

- *সরকারি উদ্যোগ (Public Sector) :* সরকারি ক্ষেত্রের শিল্পগুলো সরকার কিংবা সরকারি এজেন্সির মালিকানায় এবং পরিচালনায় গড়ে ওঠে (যেমন- BHEL, SAIL ইত্যাদি)।
- *বেসরকারি উদ্যোগ (Private Sector) :* বেসরকারি ক্ষেত্রের শিল্পগুলো ব্যক্তিগত অথবা ব্যক্তিবর্গের মালিকানায় এবং পরিচালনায় গড়ে ওঠে। যেমন- TISCO, Bajaj Auto Ltd., Dabur Industries ইত্যাদি।
- *যৌথ উদ্যোগ (Joint Sector) :* এইরূপ শিল্প রাজ্য সরকার ও ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে। যেমন-অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড (OIL) সংস্থাটি সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানায় পরিচালিত হয়।
- *সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগ (Co-operative Sector) :* সমবায় ক্ষেত্রের শিল্পগুলো উৎপাদকবর্গের বা কাঁচামাল সরবরাহকারী, কর্মীবৃন্দ বা উভয়ের মালিকানায় গড়ে ওঠে। তাঁরা সম্পদে যৌথভাবে অংশীদার হয় এবং লাভক্ষতি আনুপাতিক হারে ভাগ করে নেয়। এরূপ শিল্পের উদাহরণ হল মহারাষ্ট্রের চিনিশিল্প, কেরালার নারিকেলের ছোবড়ার ওপর গড়ে ওঠা শিল্প।

কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ এবং ওজনের ওপর ভিত্তি করে :

- ভারী শিল্পগুলো হল যেমন- লৌহ ও ইস্পাত শিল্প।
- হালকা শিল্প হল যে শিল্পে হালকা ওজনের কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় এবং হালকা ওজনের দ্রব্য উৎপাদিত হয়, যেমন- বৈদ্যুতিক দ্রব্যের শিল্প।

কাজ

কাঁচামাল ও তৈরি দ্রব্যের পরিমাণ এবং ওজনের ওপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত শিল্পজাত দ্রব্যগুলোকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করো।

i) তেল	vi) সেলাই মেশিন
ii) বুননের কাঁটা	vii) জাহাজ নির্মাণ
iii) পিতলের বাসন	viii) বৈদ্যুতিক বাল্ব
iv) ফিউজ তার	ix) রঙের ব্রাশ
v) ঘড়ি	x) মোটর গাড়ি

কৃষিভিত্তিক শিল্প (Agro Based Industries) :

কার্পাস বয়ন, পাটজাত দ্রব্য, রেশম বয়ন, পশম বয়ন, চিনি এবং ভোজ্যতেল ইত্যাদি শিল্প কৃষিজ কাঁচামালের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

বয়নশিল্প (Textile Industry) :

ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় বয়ন শিল্প এক অনন্য স্থান দখল করে আছে, কারণ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণভাবে এই শিল্পের 14 শতাংশ অবদান রয়েছে। তাছাড়া, এই শিল্পের মাধ্যমে কৃষির পর দ্বিতীয় বৃহৎ পরিসরে 35 মিলিয়ন মানুষের রোজগারের সংস্থান হয় এবং প্রায় 24.6 শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়। মোট দেশীয় উৎপাদনে এর অবদান 4 শতাংশ। দেশের মধ্যে এটিই একমাত্র শিল্প যা কাঁচামাল থেকে অধিকতম মূল্যযুক্ত দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত শৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ এবং আত্মবিশ্বাসী।

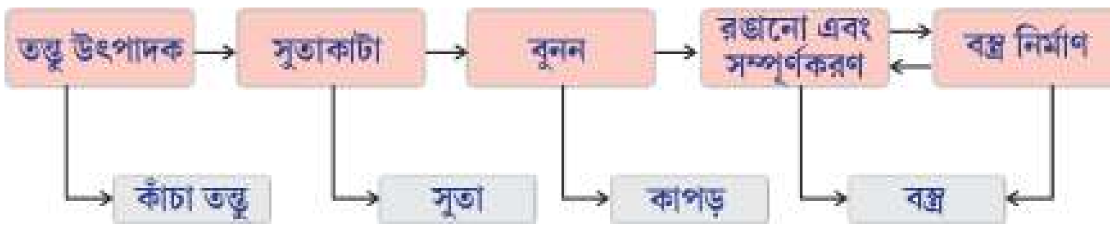

চিত্র 6.3 : বয়ন শিল্পে মূল্য সংযোজন

কার্পাস বয়নশিল্প (Cotton Textiles) :

প্রাচীন ভারতে সুতিবস্ত্র হাতে সুতা কেটে এবং হস্তচালিত তাঁতে বুননের মাধ্যমে তৈরি করা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর পরে বিদ্যুৎচালিত তাঁতের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক আমলে আমাদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলোর অবস্থার অবনতি ঘটেছিল, কারণ তারা ইংল্যান্ড থেকে আগত মেশিনে নির্মিত বস্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারছিল না।

- 1854 সালে মুম্বাইতে প্রথম সফল সুতিবস্ত্রের মিল (Mill) স্থাপিত হয়েছিল।
- ইউরোপে দুটি বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ভারত ব্রিটিশ ঔপনিবেশের অধীনে ছিল। এই সময়ে ইংল্যান্ডে কাপড়ের চাহিদা অধিক থাকায় ব্রিটিশরা ভারতীয় কার্পাস বয়নশিল্পের বিকাশে উৎসাহ প্রদান করেছিল।

2011 সালের 30 নভেম্বরে, ভারতে 1946 টি সুতি ও কৃত্রিম তন্তুর কাপড়ের মিল ছিল। এর মধ্যে শতকরা 80 ভাগ বেসরকারি ক্ষেত্রে এবং অবশিষ্ট সরকারি ও সমবায় ক্ষেত্রে ছিল। এইগুলো ছাড়াও কয়েক হাজার ছোটো কারখানা রয়েছে যাদের 4 থেকে 10 টি তাঁত আছে।

শুরুর দিকের বছরগুলোতে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে কার্পাস বয়নশিল্প গড়ে উঠেছিল। কাঁচা কার্পাস (তুলা), বাজার, পরিবহণ, সামুদ্রিক বন্দরে প্রবেশের সুবিধা, শ্রমিক, আর্দ্র জলবায়ু ইত্যাদির উপস্থিতি এই শিল্পকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। কৃষির সাথে এই শিল্পের নিকট সম্পর্ক রয়েছে এবং এটি কৃষক, কার্পাস গুটি সংগ্রহকারী এবং কার্পাস তুলা থেকে বীজের পৃথকীকরণ, সুতাকাটা, বুনন, রাঙানো, নকশা তৈরি, প্যাকেট তৈরি, সেলাই, পোশাক তৈরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জীবিকা প্রদান করে। এই শিল্পের জন্যেই অন্যান্য সহায়ক শিল্প, যেমন- রাসায়নিক, রং, প্যাকেট করার উপকরণ, ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ প্রভৃতির চাহিদা বেড়ে যায়।

যদিও সুতাকাটাকে অনবরত মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও তামিলনাড়ুতে কেন্দ্রীভূত করা হয়, কিন্তু সুতি, রেশম, জরি, কশিদা (embroidary) প্রভৃতি বস্ত্র নির্মাণে ঐতিহ্যবাহী কৌশল এবং নকশা করার জন্য বুননকে অত্যধিক বিকেন্দ্রীকরণ করা হত। ভারতে সুতাকাটার উৎপাদন বিশ্বমানের, কিন্তু বয়ন করা কাপড়ের গুণমান নিম্নমানের, তার কারণ এই দেশে অধিক উচ্চমানের সুতা ব্যবহার করতে পারত না। বয়ন কার্য হস্তচালিত তাঁত, বিদ্যুৎচালিত তাঁত এবং কারখানায় সম্পন্ন করা হয়।

হাতে বোনা খাদি কুটিরশিল্প হিসাবে তাঁতিদের ঘরে বিশাল রোজগারের সুযোগ প্রদান করে।

মহাত্মা গান্ধি সুতাকাটা এবং খাদি কাপড় বয়নের ওপর জোর দিয়েছিলেন কেন ?

সারণি 6.1 : ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বস্ত্র উৎপাদন (শতকরা হারে)

ক্ষেত্র	2009-10	2010-11 (প্রাথমিকভাবে)
কারখানা (Mill)	3.3	3.5
বিদ্যুৎচালিত তাঁত	84.1	84.1
হস্তচালিত তাঁত	11.3	11.1
অন্যান্য	1.3	1.3
মোট	100%	100%

উৎস : Office of Textile Commissioner, Mumbai, Economic Survey, 2011-12.

দ্রষ্টব্য : বয়ন, সুতাকাটা এবং প্রক্রিয়াকরণের 90% বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত সারণিটি পড়ো এবং কাপড় উৎপাদনে কারখানার অংশীদারিত্ব সম্পর্কে জান।

আমাদের দেশের জন্য বিদ্যুৎচালিত তাঁত ও হস্তচালিত তাঁতে নির্মিত লুমেজের (Loomage) তুলনায় মিলে নির্মিত লুমেজ কম রাখা গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

ভারত জাপানে সুতা রপ্তানি করে। ভারতের সুতিবস্ত্র আমদানিকারক অন্যান্য দেশগুলি হল ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা (USA), ইংল্যান্ড (UK), রাশিয়া, ফ্রান্স, পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ, নেপাল, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা এবং আফ্রিকার দেশসমূহ।

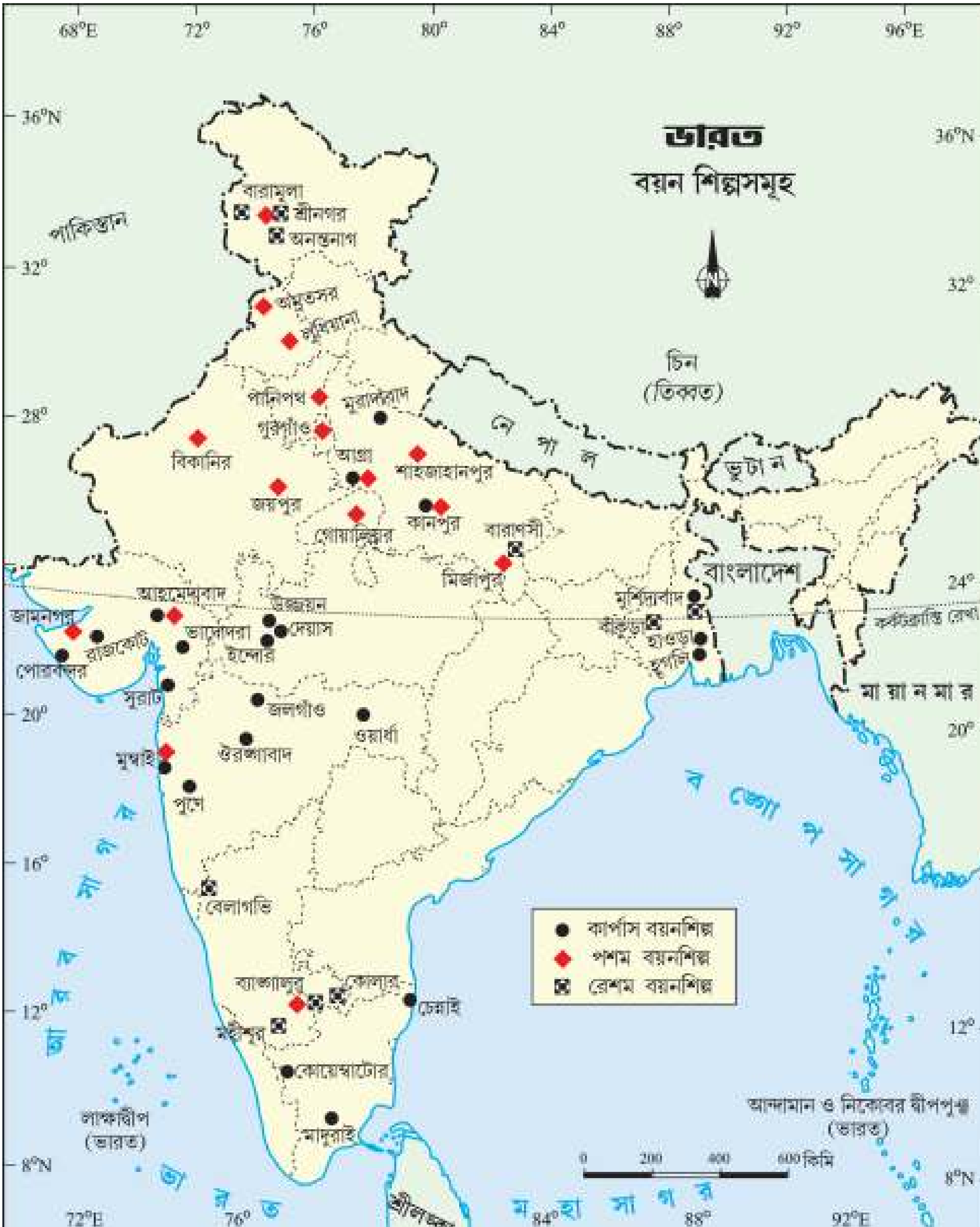

ভারত : কার্পাস, পশম ও রেশম বয়নশিল্পের বণ্টন

সুতাকাটার টাকুর ক্ষমতার দিক থেকে পৃথিবীতে চিনের পর ভারত দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থান অধিকার করে। 2011-12 সালে এই দেশে সুতাকাটার টাকুর সংখ্যা ছিল 43.13 মিলিয়ন। 1980 দশকের মাঝামাঝি সময়ে সুতাকাটার ক্ষেত্রকে অনেকটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কার্পাস সুতার বিশ্ব বাণিজ্যে আমাদের দেশের বিশাল অবদান রয়েছে। হিসাবে দেখা যায় এটি মোট অন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের এক-চতুর্থাংশ। যাই হোক, বিশ্বের মোট তৈরি বস্ত্র বাণিজ্যে ভারতের অংশ মাত্র 4 শতাংশ। আমাদের সুতাকাটার মিলগুলো বিশ্বস্তরে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা রাখে এবং আমরা যে সমস্ত তন্তু উৎপন্ন করি সেগুলো সকলে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু সুতাকাটা, বয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটগুলো দেশে উৎপাদিত উচ্চমানের সুতা ব্যবহার করতে পারে না। এই বিভাগে কিছু বড়ো এবং আধুনিক কারখানা রয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ উৎপাদন ছোটো ছোটো কারখানায় হয়, যাদের উৎপাদন স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এই অসংগতির ফলে শিল্পে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ফলে আমাদের অনেক সুতাকাটার কর্মীদের কার্পাস সুতা রপ্তানি করতে হয় এবং বস্ত্র নির্মাতাদের বস্ত্র আমদানি করতে হয়।

ধরো এক কিলোগ্রাম সুতা 85 টাকায় বিক্রয় হয়। যদি এটি একটি পায়জামা হিসাবে বিক্রয় হয়, তবে এর মূল্য প্রতি কিলোগ্রাম 800 টাকা হয়। তন্তু থেকে সুতা, সুতা থেকে কাপড় এবং কাপড় থেকে পোশাক তৈরির প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল্য যুক্ত হতে থাকে।

আমাদের কাছে বিশাল পরিমাণে সুতা রপ্তানির চেয়ে বয়ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করা কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

যদিও, আমরা উন্নত মানের দীর্ঘ তন্তুযুক্ত কার্পাসের (2015-16 সালে 170 কিলোগ্রামের 301.5 লক্ষ গাঁট) উৎপাদন তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি করেছি, তথাপি আমদানির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হচ্ছে। বিশেষ করে বয়ন ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে অনিয়মিত বিদ্যুৎ পরিসেবার অনিশ্চয়তা দূর করা এবং উন্নত যন্ত্রাংশের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। অন্যান্য সমস্যাগুলো হল শ্রমিকের কম উৎপাদনশীলতা এবং কৃত্রিম বস্ত্রশিল্পের সাথে তুমুল প্রতিযোগিতা।

পাট বয়নশিল্প (Jute Textiles)

ভারত কাঁচাপাট এবং পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে বৃহত্তম উৎপাদক দেশ এবং বাংলাদেশের পর পৃথিবীতে রপ্তানিকারক রূপে দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থানাধিকারী দেশ। 2010-11 সালে ভারতে প্রায় 80 টি পাটকল ছিল। এই পাটকলগুলোর বেশিরভাগই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। প্রধানত হুগলি নদীর তীর বরাবর (98 কিমি লম্বা এবং 3 কিমি প্রশস্ত) একটি সংকীর্ণ বলয়ে গড়ে উঠেছে।

1855 সালে কলকাতার নিকটে রিষড়ায় প্রথম পাটকল স্থাপন করা হয়েছিল। 1974 সালে দেশ বিভাগের পর পাটকলগুলো ভারতে রয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তিন-চতুর্থাংশ পাট উৎপাদক অঞ্চল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের অধীনে চলে গিয়েছিল।

হুগলি নদীর তীরে পাটশিল্প গড়ে ওঠার কারণগুলো হল : পাট উৎপাদক অঞ্চলের নৈকট্য, স্বল্প খরচে পরিবহণ, রেলপথ, সড়কপথ ও জলপথের নেটওয়ার্ক বা ব্যবস্থা, কাঁচামাল কারখানায় নিয়ে আসার সুবিধা, কাঁচা পাটের প্রক্রিয়াকরণের জন্য জলের প্রাচুর্য, পশ্চিমবঙ্গ এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে সুলভ শ্রমিক প্রাপ্তির সুবিধা। এছাড়া কলকাতা নগর কেন্দ্র হওয়ার সুবাদে ব্যাংকিং, বিমা প্রভৃতির সুবিধার পাশাপাশি বন্দরের সুবিধাও প্রদান করে।

2010-11 সালে পাটশিল্পে প্রত্যক্ষভাবে 3.7 লক্ষ শ্রমিক এবং অন্য 40 লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা পাট ও মেস্তা চাষে নিযুক্ত ছিল। এই শিল্পের সাথে আরও অনেক মানুষ অপ্রত্যক্ষভাবেও যুক্ত থাকত।

আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের পরিপূরক কৃত্রিম দ্রব্যের উপস্থিতি এবং বাংলাদেশ, ব্রাজিল, ফিলিপাইন, মিশর ও থাইল্যান্ডের মতো অনেক দেশের তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে এই শিল্প অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। যদিও সরকারি নীতির মাধ্যমে প্যাকেটজাত করার ক্ষেত্রে পাটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার কারণে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়েছিল। চাহিদা বাড়াতে উৎপাদিত দ্রব্যে বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন। 2005 সালে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাতীয় পাট শিল্প নীতি গ্রহণ করা হয়েছে যার উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদন বৃদ্ধি, পাটের গুণমানের উন্নতি, পাটচাষিদের ভালো মূল্য প্রদানের নিশ্চয়তা এবং প্রতি হেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ঘানা, সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়া হল পাটজাত দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের মুখ্য বাজার। পরিবেশ বান্ধব, জৈবনিম্নিকরণীয় পদার্থের জন্য বর্ধিত বিশ্ব জনসচেতনা আবারও একবার পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের সুযোগ প্রদান করেছে।

চিনিশিল্প (Sugar Industry)

ভারত চিনি উৎপাদনে পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশ, কিন্তু গুড় ও খান্দসারি উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল ভারী হয় এবং পরিবহণ জনিত কারণে তার

সুক্রোজ (Sucrose) এর পরিমাণ কমতে থাকে। চিনিশিল্পের আদর্শ স্থান কোথায় হওয়া উচিত ? 2010-11 সালে দেশে 662 টি চিনিকল ছিল যেগুলো উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং গুজরাটসহ পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও মধ্য প্রদেশে অবস্থিত। চিনিকলের শতকরা 60 ভাগ উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে অবস্থিত। এই শিল্প ঋতুভিত্তিক হওয়ায় সমবায় উদ্যোগে গড়ে ওঠাই উপযুক্ত। কেন এরূপ হয় তা তোমরা কি ব্যাখ্যা করতে পারবে ?

বর্তমান বছরগুলোতে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলোতে বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে চিনিকলগুলোর স্থানান্তর এবং কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতা দেখা যায়। এর মুখ্য কারণ এখানকার আখের মধ্যে অধিক পরিমাণ সুক্রোজের উপস্থিতি। অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা জলবায়ু দীর্ঘ সময় ধরে রস নিষ্কাশনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। অধিকন্তু এই রাজ্যগুলোতে সমবায় সমিতিগুলো অধিক সফল।

এই শিল্পের প্রধান সমস্যাগুলো হল এই শিল্পের প্রকৃতি ঋতুভিত্তিক, পুরোনো ও অদক্ষ পদ্ধতিতে উৎপাদন, কারখানায় আখ পৌঁছাতে পরিবহণে বিলম্ব এবং আখের ছিবড়ার অধিকতম ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা।

খনিজভিত্তিক শিল্প (Mineral based Industries)

যে শিল্পগুলোতে কাঁচামাল হিসাবে খনিজ এবং ধাতু ব্যবহার করা হয়, তাদের খনিজভিত্তিক শিল্প বলা হয়। এই শিল্পের অন্তর্গত কিছু শিল্পের নাম তোমরা বলতে পারবে কি ?

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry)

যন্ত্রপাতির ওপর নির্ভরশীল ভারী, মাঝারি ও হালকা সকল শিল্পের মূল শিল্প হল লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। বিভিন্ন প্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, নির্মাণ সামগ্রী, প্রতিরক্ষা, চিকিৎসা, টেলিফোন, বৈজ্ঞানিক উপকরণ এবং বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্য সামগ্রী তৈরিতে ইস্পাত প্রয়োজন।

কাজ

ইস্পাতের তৈরি বিভিন্ন দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করো যেগুলো তোমরা মনে করতে পারো।

ইস্পাতের উৎপাদন ও ব্যবহার একটি দেশের উন্নতির সূচক হিসাবে মনে করা হয়। লৌহ ও ইস্পাত একটি ভারী শিল্প, কারণ এই শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও উৎপাদিত দ্রব্য উভয়ই ভারী ও বিশাল এবং এর পরিবহণ ব্যয়ও বেশি হয়। এই শিল্পের জন্য প্রায় 4:2:1 অনুপাতে যথাক্রমে লৌহ আকরিক, কোক কয়লা ও চুনাপাথর প্রয়োজন। ইস্পাতকে দৃঢ় বানানোর জন্য কিছু পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজও প্রয়োজন। ইস্পাত শিল্প স্থাপনের আদর্শ স্থান কোথায় হওয়া উচিত ? এ বিষয়ে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই শিল্পে নির্মিত দ্রব্যগুলোকে বাজারজাত ও ভোক্তাদের কাছে প্রেরণ করার জন্য উপযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন।

2016 সালে 95.6 মিলিয়ন টন অপরিশোধিত ইস্পাত তৈরি করে ভারত পৃথিবীর অপরিশোধিত ইস্পাত উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। এটি স্পঞ্জ লোহার (বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত লোহা) বৃহত্তম উৎপাদক। 2016 সালে দেশে ইস্পাতের ব্যবহার জন প্রতি বছরে শুধুমাত্র 63 কিলোগ্রামের কাছাকাছি ছিল যেখানে পৃথিবীতে এর পরিমাণ গড়ে 208 কিগ্রা।

ইস্পাত নির্মাণ পদ্ধতি

চিত্র : 6.4

ভারত : লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রসমূহ

কাজ

সারণি 6.2 : ভারতে নির্মিত ইস্পাতের মোট উৎপাদন

বছর	বার্ষিক উৎপাদন (মেট্রিক টন)
2010–11	68.62
2011–12	75.70
2012–13	81.68
2013–14	87.67
2014–15	92.16
2015–16	91.00
2016–17	101.3

উৎস : *Ministry of Steel, Government of India*

ভারতে জন প্রতি ইস্পাতের ব্যবহার এত কম কেন ?

কাজ

ভারতে ইস্পাত শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।

ক্ষুদ্রায়তনের ইস্পাত শিল্প হল অনেক ছোটো আকারের ইস্পাত কারখানা যেখানে বৈদ্যুতিক চুল্লি, ইস্পাতের পাত ও স্পঞ্জ লোহা ব্যবহৃত হয়। এখানে ঠিক একইভাবে ইস্পাত পিণ্ড ব্যবহার করে পুনর্বার রোলিং (rolling) করা হয়। এখানে নির্ধারিত গুণাগুণের সংকর ইস্পাত এবং হালকা ইস্পাত উৎপাদন করা হয়।

একটি সম্মিলিত ইস্পাত শিল্প হল বড়ো আকারের ইস্পাত কারখানা যেখানে কাঁচামালকে একই স্থানে একত্রিত করা থেকে শুরু করে ইস্পাত তৈরি, ইস্পাতের রোলিং এবং ইস্পাতের আকৃতি দেওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজই সম্পন্ন করা হয়।

সরকারি ক্ষেত্রের বেশিরভাগ সংস্থা তাদের উৎপাদিত ইস্পাত "স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (SAIL)" এর মাধ্যমে বাজারজাত করে।

1950 দশকে চিন ও ভারত প্রায় একই পরিমাণের ইস্পাত উৎপাদন করেছিল। বর্তমানে চিন হল ইস্পাত উৎপাদনের বৃহত্তম উৎপাদক দেশ। পৃথিবীতে ইস্পাতের বৃহত্তম ভোক্তা দেশও চিন।

ছোটোনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে অধিকাংশ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কেন্দ্রগুলো কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এটির মূল কারণ, এই অঞ্চলে শিল্প বিকাশের জন্য তুলনামূলকভাবে অধিক অনুকূল পরিবেশের উপস্থিতি। আকরিক লোহার নিম্ন ব্যয়, উচ্চমানের কাঁচামালের নৈকট্য, সুলভ শ্রমিক এবং স্থানীয় বাজারে এই শিল্পের চাহিদার বিশাল সম্ভাবনা ইত্যাদি এই শিল্পকে গড়ে তোলার অনুকূল পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। যদিও ভারত পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদক দেশ। এরপরেও আমরা এই শিল্পের সম্পূর্ণ সম্ভাব্য বিকাশ ঘটাতে পারিনি, এর কারণ : a) জ্বালানি কয়লার অপর্যাপ্ততা এবং উচ্চমূল্য b) শ্রমিকের কম উৎপাদন ক্ষমতা c) শক্তির অনিয়মিত জোগান d) নিম্নমানের পরিকাঠামো।

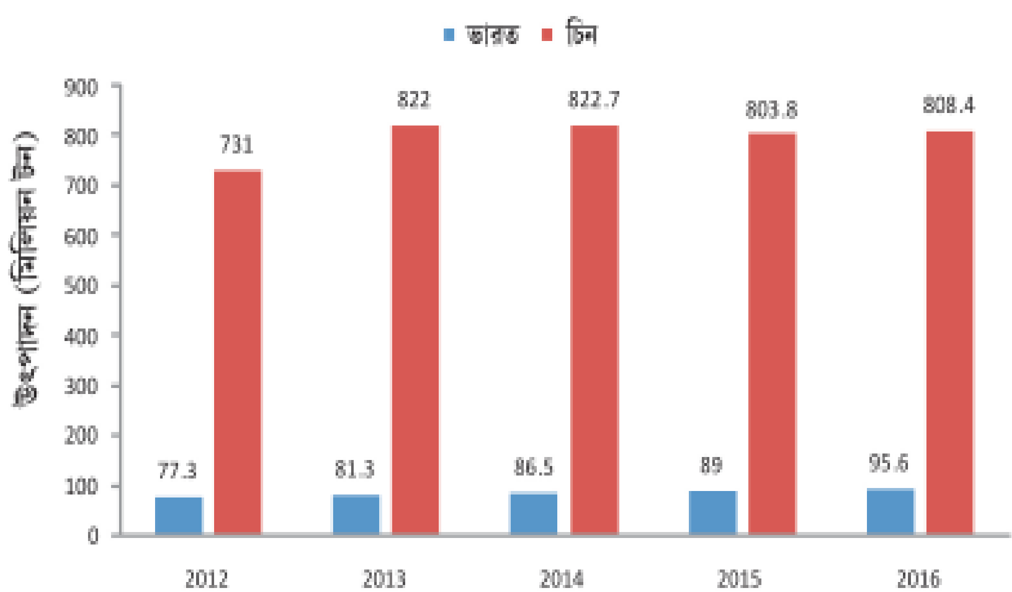

চিত্র 6.5 : ভারত ও চিনের কাঁচা ইস্পাতের উৎপাদন

উৎস : *World Steel Association, website: www.worldsteel.org*

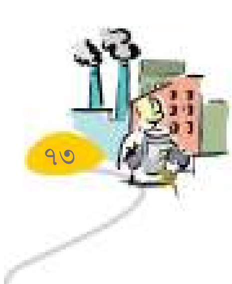

আমরাও অন্যান্য দেশ থেকে উচ্চমানের ইস্পাত আমদানি করি। যাই হোক, সামগ্রিকভাবে উৎপাদিত ইস্পাত আমাদের দেশীয় চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত।

উদারীকরণ এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প গঠনের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ প্রদান করেছে। ইস্পাত শিল্পকে আরও প্রতিযোগী করে তুলতে গবেষণা ও বিকাশের জন্য সম্পদের স্থান নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

কাজ

তোমরা কি কলিঙ্গ নগরের বিবাদ সম্বন্ধে পড়েছ ? বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করো এবং আলোচনা করো।

অ্যালুমিনিয়াম বিগলন (Aluminium Smelting)

ভারতে অ্যালুমিনিয়াম বিগলন দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধাতু নিষ্কাশন শিল্প। অ্যালুমিনিয়াম হালকা, ক্ষয়রোধী, তাপের সুপরিবাহী, নমনীয় হয় এবং অন্য ধাতুর সাথে মিশিয়ে এটিকে অত্যন্ত দৃঢ় বানানো যায়। বিমানের কাঠামো, বাসনপত্র এবং তার তৈরিতে এটি ব্যবহার করা হয়। বেশ কিছু শিল্পে ইস্পাত, তামা, দস্তা ও সিসার বিকল্প হিসাবে এর জনপ্রিয়তা বেড়েছে।

দেশে অ্যালুমিনিয়াম বিগলন কারখানা ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাডু রাজ্যে গড়ে উঠেছে। 2014-15 সালে ভারত প্রায় 3.96 মিলিয়ন টন অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করেছিল।

চিত্র 6.6 : নেলকো (NALCO) এর বিগালক কেন্দ্রে পাত নির্মাণ কারখানা

বিগালকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত বক্সাইট খুব ভারী ও গাঢ় লাল বর্ণের শিলা। নিম্নে প্রদত্ত প্রবাহী চার্টের মাধ্যমে অ্যালুমিনিয়াম তৈরির পদ্ধতি দেখানো হল। এই শিল্পের অবস্থান নির্ধারণের প্রধান দুটি কারণ হল নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং নিম্ন ব্যয়ে কাঁচামাল সংগ্রহ করা।

কাজ

একটি কারখানা প্লাস্টিকের হাতলযুক্ত অ্যালুমিনিয়ামের বাসন (Saucepans) তৈরি করে। কারখানাটি বিগালক (Smelter) কেন্দ্র থেকে অ্যালুমিনিয়াম এবং অন্য কারখানা

4 থেকে 6 টন বক্সাইট → 2 টন অ্যালুমিনা → 1 টন অ্যালুমিনিয়াম

চিত্র : 6.7

শিল্প কারখানায় অ্যালুমিনিয়াম নির্মাণের প্রক্রিয়া

চিত্র : 6.8

থেকে প্লাস্টিকের উপাদান সংগ্রহ করে। সমস্ত তৈরি বাসনগুলোকে মালের গুদামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

1. a) কোন্ কাঁচামালটির পরিবহণ ব্যয় সবচেয়ে বেশি এবং কেন ?

   b) কোন্ কাঁচামালটির পরিবহণ ব্যয় সবচেয়ে সস্তা এবং কেন ?

2. তোমরা কি মনে কর প্যাকেটজাত করার পর তৈরি দ্রব্যের পরিবহণ ব্যয় অ্যালুমিনিয়াম ও প্লাস্টিকের পরিবহণ ব্যয় অপেক্ষা সস্তা বা অধিক হবে।

রাসায়নিক শিল্প (Chemical Industry)

ভারতে রাসায়নিক শিল্প দ্রুত বিকশিত ও বহুমুখী হচ্ছে। মোট দেশীয় উৎপাদনে এর অবদান প্রায় শতকরা 3 ভাগ। এই শিল্প এশিয়া মহদেশে তৃতীয় বৃহত্তম এবং পৃথিবীতে আকার অনুযায়ী দ্বাদশতম স্থান অধিকার করে। এই শিল্পে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় প্রকারের নির্মাণ কারখানা জড়িত রয়েছে। জৈব ও অজৈব উভয় ক্ষেত্রে এই শিল্পের দ্রুত বিকাশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অজৈব রাসায়নিকের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যগুলো হল সালফিউরিক অ্যাসিড (সার, কৃত্রিম তন্তু, প্লাস্টিক, গদ, রং, ছাঁচ উপকরণ তৈরিতে ব্যবহৃত), নাইট্রিক অ্যাসিড, সার, সোডা ভস্ম (কাচ, সাবান ও ডিটারজেন্ট, কাগজ তৈরিতে ব্যবহৃত) এবং কস্টিক সোডা। এই শিল্প সারা দেশে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

তোমরা কি ভাবতে পারো কেন এমন হয় ?

পেট্রোরসায়ন জৈব রাসায়নিকের অন্তর্ভুক্ত যা কৃত্রিম তন্তু, কৃত্রিম রবার, প্লাস্টিক, ছাঁচের উপকরণ, ঔষধ ও ঔষধ তৈরির উপকরণ প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। জৈব রাসায়নিক কারখানা তেল শোধনাগার কিংবা পেট্রোরসায়ন কারখানার নিকটে স্থাপিত হয়।

রাসায়নিক শিল্প নিজেই তার বৃহত্তম ভোক্তা। মূল রাসায়নিক পদার্থগুলো প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করা হয় যেগুলো শিল্পসংক্রান্ত প্রয়োগ, কৃষি অথবা প্রত্যক্ষভাবে ভোক্তাদের বাজারের জন্য ব্যবহৃত হয়। তোমরা অবগত আছ এমন শিল্পদ্রব্যের একটি তালিকা তৈরি করো।

সার শিল্প (Fertiliser Industry)

নাইট্রোজেন ঘটিত সার (প্রধানত ইউরিয়া), ফসফেটিক সার এবং অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট সার (DAP) এবং নাইট্রোজেন (N), ফসফেট (P), ও পটাশ (K)-এর সংমিশ্রণে ঘটিত মিশ্রসার উৎপাদক ক্ষেত্রের চারপাশকে কেন্দ্র করে সারশিল্প গড়ে উঠেছে। মিশ্রসারের তৃতীয় উপাদান অর্থাৎ পটাশ সম্পূর্ণ আমদানি করা হয়, কারণ আমাদের দেশে বাণিজ্যিকভাবে কিংবা যে-কোনো রূপে ব্যবহারযোগ্য পটাশ বা পটাশ যৌগের কোনো ভাণ্ডার নেই। ভারত নাইট্রোজেন ঘটিত সারের তৃতীয় বৃহত্তম উৎপাদক দেশ। এখানে 57 টি সার কারখানা রয়েছে যেখানে নাইট্রোজেন ঘটিত মিশ্রসার তৈরি করা হয়; 29টি কারখানায় ইউরিয়া এবং 9 টি কারখানায় উপজাত দ্রব্য হিসাবে অ্যামোনিয়া সালফেট উৎপাদন করা হয় এবং 68 টি অন্য ছোটো কারখানায় এককভাবে সুপার ফসফেট উৎপাদন করা হয়। সরকারের অধীনে 10 টি এবং ভারতের সার নিগমের অধীনে গুজরাটের হাজিরায় সমবায় ক্ষেত্রে 1টি কারখানা রয়েছে।

সবুজ বিপ্লবের পর এই শিল্প দেশের অন্যান্য অনেক স্থানে বিস্তার লাভ করে। গুজরাট, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও কেরল মোট সার উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক উৎপাদন করে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সার উৎপাদক রাজ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান, বিহার, মহারাষ্ট্র, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, গোয়া, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ ও কর্ণাটক।

সিমেন্টশিল্প (Cement Industry)

নির্মাণ কার্য যেমন- দালানবাড়ি, কারখানা, সেতু, রাস্তা, বিমানবন্দর, বাঁধ এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ প্রভৃতির জন্য সিমেন্ট প্রয়োজন। এই শিল্পে বিশাল (Bulky) ও ভারী কাঁচামাল যেমন- চুনাপাথর, সিলিকা এবং জিপসাম প্রয়োজন। রেল পরিবহণের চেয়ে এতে অতিরিক্ত কয়লা ও বিদ্যুৎ প্রয়োজন।

কাজ

সিমেন্ট তৈরির কারখানা কোথায় স্থাপন করলে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে ?

গুজরাট এই শিল্পের কৌশলগত অবস্থানে রয়েছে, কারণ এখান থেকে উপসাগরীয় দেশগুলোর বাজার উপলব্ধ করা সুবিধাজনক।

কাজ

ভারতের অন্য রাজ্যের কোথায় এই শিল্প গড়ে উঠেছে খুঁজে বের করো। তাদের নাম বলো।

1904 সালে চেন্নাইতে প্রথম সিমেন্ট কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর এই শিল্পের বিস্তার ঘটে। 1989 সালে মূল্য ও বণ্টনের নিয়ন্ত্রণ এবং অন্য নীতির পুনর্গঠন সিমেন্ট শিল্পকে ক্ষমতা, প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি এবং উৎপাদনে দ্রুত উন্নতি লাভে পরিচালিত করেছিল।

গুণমানের উন্নতির কারণে দেশের বিশাল চাহিদার অতিরিক্ত পূর্ব এশিয়া, মধ্যপূর্ব আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার বাজারেও এই

শিল্পের চাহিদা বেড়েছে। এই শিল্প উৎপাদন ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই প্রগতি করছে। সিমেন্ট শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দেশের বিশাল চাহিদা এবং সরবরাহ বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে।

মোটরগাড়ি নির্মাণশিল্প (Automobile Industry)

মোটরগাড়ি যাত্রীদের এবং মালপত্রের দ্রুত পরিবহণের জন্য সুবিধা প্রদান করে। ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে ট্রামগাড়ি, বাসগাড়ি, গাড়ি, মোটর সাইকেল, স্কুটার, তিন চাকার গাড়ি এবং বহু উপযোগী যানবাহন নির্মাণ করা হয়। উদারীকরণের পর নতুন ও আধুনিক মডেল বাজারে আসায় যানবাহনের চাহিদা বৃদ্ধি পায় যা এই শিল্পের উন্নতি নিয়ে আসে। এর অন্তর্ভুক্ত যাত্রীবাহী, দুই ও তিন চাকার গাড়ির চাহিদা আরও বেড়ে যায়। বিগত 15 এর চেয়ে কম বছরে এই শিল্প অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সাথে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে এই শিল্পকে বিশ্বমানের উন্নতির স্তরে নিয়ে আসা হয়েছিল। বর্তমানে 15 টি কারখানার যাত্রীবাহী গাড়ি ও বহুউপযোগী বাহন, 9 টি কারখানায় বাণিজ্যিক বাহন, 14টি কারখানায় দুই ও তিন চাকার গাড়ি নির্মাণ করা হয়। এই শিল্প দিল্লি, গুরগাঁও, মুম্বাই, পুণে, চেন্নাই, কলকাতা, লখনউ, ইন্দোর, হায়াদ্রাবাদ, জামশেদপুর এবং ব্যাঙ্গালুরুর চারপাশে গড়ে উঠেছে।

তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রনিক্স শিল্প (Information Technology and Electronics Industry)

ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের অন্তর্গত এক বিশাল পরিসরে উৎপাদিত দ্রব্য যেমন- রেডিয়ো থেকে শুরু করে টেলিভিশন, টেলিফোন, সেলুলার, টেলিকম, পেজার, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, র‍্যাডার, কম্পিউটার এবং টেলিকমিউনিকেশন শিল্পের প্রয়াজনীয় অন্যান্য অনেক উপকরণ তৈরি করা হয়। ব্যাঙ্গালুরু ভারতের ইলেক্ট্রনিক্স রাজধানী হিসাবে উঠে এসেছে। ইলেক্ট্রনিক্স দ্রব্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদক কেন্দ্রগুলো মুম্বাই, দিল্লি, হায়াদ্রাবাদ, পুণে, চেন্নাই, কলকাতা, লখনউ ও কোয়েম্বাটোরে অবস্থিত। 210-11 সালের মধ্যে ভারতে সফট ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক (STPI) দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে 46 টিরও বেশি স্থানে গড়ে উঠেছে। যাই হোক, প্রধান শিল্প কারখানাগুলো ব্যাঙ্গালুরু, নয়ডা, মুম্বাই, চেন্নাই, হায়াদ্রাবাদ ও পুণেতে কেন্দ্রীভূত। রোজগার বাড়াতে এই শিল্পের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। এটি অত্যন্ত উৎসাহের ব্যাপার যে, এই শিল্পে রোজগারি ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা 30 ভাগই মহিলা।

দ্রুত বেড়ে ওঠা ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার বহিঃউৎস (Business Process Outsourccing) ক্ষেত্রে বিগত দুই বা তিন বছরে এই শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সফলতার মূল কারণ হচ্ছে হার্ডওয়ার ও সফট ওয়্যার এর অনবরত বিকাশ।

চিত্র 6.9 : রূপনারায়ণপুর (পশ্চিমবঙ্গ) এর এইচ সি এল (HCL)-এ তার (Cable) নির্মাণের সুবিধা

চিত্র 6.10 : BHEL (হায়াদ্রাবাদ)-এ গ্যাস টারবাইন রোটারের (Gas Turbine Roter) সমাবেশ স্থান

শিল্পসংক্রান্ত দূষণ ও পরিবেশের অবনমন (Industrial Pollution and Environmental Degradation)

যদিও ভারতের অর্থনীতির বৃদ্ধি ও বিকাশে, শিল্পোদ্যোগের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে, তবুও ভূমি, জল, বায়ু, শব্দ দূষণের বৃদ্ধি এবং পরিবেশের পতনকে কোনো অবস্থায় উপেক্ষা করা যায় না। শিল্প চার ধরনের দূষণের জন্য দায়ী, যথা - a) বায়ু, b) জল, c) ভূমি, d) শব্দ। দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পগুলোর মধ্যে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রও অন্তর্ভুক্ত।

বায়ুদূষণ (Air Pollution)

অধিক অনুপাতে অবাঞ্ছিত গ্যাস, যেমন সালফার ডাইঅক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড এর উপস্থিতি বায়ুদূষণের কারণ। বায়ুবাহিত

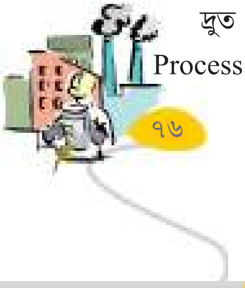

ভারত : কিছু সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক

কণাবিশেষ পদার্থে কঠিন ও তরল উভয় প্রকারের কণাই থাকে, যেমন- ধুলো, স্প্রে, কুয়াশা ও ধোঁয়া। রাসায়নিক ও কাগজ শিল্প, ইটের ভাটি, তেল শোধনাগার ও বিগলন কারখানা, দূষণ নিয়মকে অগ্রাহ্য করে গড়ে ওঠা ছোটো ও বড়ো কারখানা থেকে জীবাশ্ম জ্বালানির ফলে ধোঁয়া নির্গত হয়। বিষাক্ত গ্যাসের নির্গমন দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবযুক্ত ভীষণ ভয়ানক হতে পারে। তোমরা কি ভোপাল গ্যাস দূর্ঘটনা সম্পর্কে জান ? বায়ুদূষণ মানব স্বাস্থ্য, পশু, উদ্ভিদ, দালান এবং সমগ্র পরিবেশের ওপর কুপ্রভাব ফেলে।

জলদূষণ (Water Pollution)

শিল্প কারখানার জৈব ও অজৈব বর্জ্য পদার্থকে নদীতে স্বচ্ছন্দে নিক্ষেপের কারণে জলদূষণ হয়। জলদূষণের মুখ্য অপরাধী হল কাগজ, মণ্ড, রাসায়নিক, বস্ত্র বয়ন ও রাঙানোর শিল্প, তেল শোধনাগার, চর্মশিল্প ও তড়িৎলেপন শিল্প যা রং, ডিটারজেন্ট, অ্যাসিড, লবণ এবং ভারী ধাতু যেমন- সিসা, পারদ, কীটনাশক, সার, কার্বন, প্লাস্টিক ও রবারসহ কৃত্রিম রাসায়নিক ইত্যাদি জলে নিক্ষেপ করে। উড়ন্ত ছাই, ফসপো-জিপসাম এবং লৌহ ও ইস্পাতের ধাতুমল হচ্ছে ভারতের মুখ্য কঠিন বর্জ্য পদার্থ।

তাপীয় দূষণ (Thermal Pollution)

জলে তাপীয় দূষণ দেখা যায় যখন কারখানা ও তাপকেন্দ্র থেকে নির্গত গরম জল, ঠান্ডা না করে নদী বা পুকুরে নিষ্কাশন করা হয়। জলজ প্রাণীদের ওপর এর কীরূপ প্রভাব পড়বে ?

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য এবং পরমাণু ও অস্ত্র উৎপাদক কারখানা থেকে ক্যান্সার, জন্মগত বিকার ও অকাল প্রসবের মতো রোগ হয়। মাটি ও জলদূষণ নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। বর্জ্য পদার্থের স্তূপীকৃতকরণ বিশেষ করে কাচ, ক্ষতিকারক রাসায়নিক, কারখানার ময়লা, প্যাকেটজাতকরণ, লবণ এবং আবর্জনা প্রভৃতি মাটিকে অনুপযুক্ত করে তোলে। বৃষ্টির জলের সাথে দূষিত পদার্থগুলো মাটির সুক্ষ ছিদ্র দিয়ে চুঁইয়ে ভূনিম্নস্থ জল পর্যন্ত পৌঁছায় এবং ওই জলকেও দূষিত করে।

শব্দদূষণ (Noise Pollution)

শব্দদূষণ শুধুমাত্র রাগিয়ে তোলে বা উত্তেজিত করে না, বরং এটি অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ যেমন- শ্রবণ অক্ষমতা, হৃদগতির হার এবং রক্তচাপও বাড়িয়ে দেয়। অবাঞ্ছিত শব্দ যন্ত্রণাদায়ক এবং মানসিক চাপের উৎস। শিল্পসংক্রান্ত ও নির্মাণ কার্যাবলি, যন্ত্রপাতি, কারখানার উপকরণ, জেনারেটার, কাঠ চেরা, গ্যাস সংক্রান্ত যন্ত্র এবং বৈদ্যুতিক ড্রিলও প্রচুর শব্দ উৎপন্ন করে।

পরিবেশের অবনমন নিয়ন্ত্রণ
(Control of Environmental Degradation)

আমাদের দেশীয় কারখানাগুলো থেকে নির্গত এক লিটার বর্জ্য জল প্রায় আটগুণ স্বচ্ছ জলকে দূষিত করে। কীভাবে স্বচ্ছ জলের শিল্প দূষণ হ্রাস করা যাবে ? কিছু পরামর্শ দেওয়া হল —

i) দুই বা তার বেশি ধারাবাহিক পর্যায়ে পুনর্ব্যবহার ও পুনর্চক্রীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণের জন্য জলের ব্যবহার কমানো।

ii) জলের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা।

iii) নদী ও পুকুরে নিক্ষেপ করার পূর্বে গরম জল ও ময়লা জলের শোধন করা। তিনটি পর্যায়ে শিল্প কারখানার ময়লা জল শোধন করা যেতে পারে—

a) যান্ত্রিক শোধনের মাধ্যমে প্রাথমিক শোধন। অপরিশোধিত পদার্থের পৃথকীকরণ (Screening), চূর্ণবিচূর্ণকরণ (Grinding), পশমিতকরণ (Flocculation) ও অধঃক্ষেপণ (Sedimentation) এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

b) জৈবিক প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় স্তরের শোধন।

c) জৈবিক, রাসায়নিক ও ভৌতিক প্রক্রিয়ায় তৃতীয় স্তরের শোধন। বর্জ্যজলের পুনর্চক্রীকরণ এর সাথে জড়িত।

যেখানে ভূনিম্নস্থ জল সম্পদের পরিমাণ কম, সেখানে শিল্প কারখানা কর্তৃক ভূনিম্নস্থ জল ভাণ্ডারের জল অতিমাত্রায় উত্তোলনের ওপর আইনানুগ বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন। কারখানায় উঁচু ধোঁয়া নির্গমনকারী চিমনি লাগিয়ে এবং চিমনির সাথে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অধঃক্ষেপণ, ফেব্রিক শোধক, স্ক্রবার যন্ত্র ও গ্যাসীয় দূষক পৃথক করার উপকরণ ইত্যাদি যুক্ত করার মাধ্যমে বায়ুর দূষক পদার্থগুলোকে কমানো যেতে পারে। কারখানায় ব্যবহৃত কয়লার পরিবর্তে তেল বা গ্যাস ব্যবহার করে ধোঁয়া নির্গমন কমানো যেতে পারে। যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে এবং জেনারেটারের সাথে সাইলেন্সার লাগানো উচিত। প্রায় সব যন্ত্রপাতি এমনভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যেন শক্তির ক্ষমতা বাড়ে এবং শব্দ দূষণ কম হয়। শব্দ শোষণকারী উপকরণ ব্যবহারের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কানে উচ্চস্বর নিয়ন্ত্রণকারী উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

চিত্র 6.11 : ফরিদাবাদে যমুনা অ্যাকশন প্ল্যানের অধীনে বর্জ্যতরল পরিশোধন কারখানা

স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পরিবেশগত বিষয়ের সাথে যুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংহতি প্রয়োজন।

জাতীয় তাপবিদ্যুৎ নিগমের দেখানো পথ (NTPC Shows the Way)

ভারতে জাতীয় তাপবিদ্যুৎ নিগম (NTPC) একটি মুখ্য বিদ্যুৎ প্রদানকারী নিগম। নিগমের কাছে পরিবেশ পরিচালন পদ্ধতি (EMS) 14001 এর জন্য আই এস ও (ISO) এর প্রমাণপত্র আছে। যেসব স্থানে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয় সেইসব স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বিভিন্ন সম্পদ যেমন- জল, তৈল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানি সংরক্ষণে নিগমের একটি সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এটা নিম্নলিখিত উপায়ে সম্ভব -

a) আধুনিক প্রযুক্তিযুক্ত উপকরণের সঠিক ব্যবহার করে এবং বর্তমান উপকরণগুলোর সংস্কার করে।
b) অধিকতম ভস্ম ব্যবহারের মাধ্যমে বর্জ্যপদার্থের ন্যূনতম উৎপাদন করে।
c) প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সবুজ বলয় গড়ে তোলে এবং বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণে উৎসাহিত করে।
d) ছাই সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা, ছাইযুক্ত জলের পুনর্চক্রায়ন এবং তরল বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশের দূষণ হ্রাস করা।
e) সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর জন্য বাস্তুতান্ত্রিক উপায়ে দেখাশোনা, সমীক্ষা করা এবং অন লাইনে তথ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

চিত্র 6.12 : রামাগুন্ডম প্ল্যান্ট

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :

i) নীচের কোন্ শিল্পে চুনাপাথর কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে ?
a) অ্যালুমিনিয়াম b) সিমেন্ট c) প্লাস্টিক d) মোটরগাড়ি

ii) নীচের কোন্ সংস্থা সার্বজনিক ক্ষেত্রে ইস্পাতের বাজারের ব্যবস্থা করে ?
a) HAIL b) SAIL c) TATA Steel d) MNCC

iii) নীচের কোন্ শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে বক্সাইট ব্যবহার করে ?
a) অ্যালুমিনিয়ামের বিগলন b) সিমেন্ট c) কাগজ d) ইস্পাত

iv) নীচের কোন্ শিল্প কারখানা টেলিফোন, কম্পিউটার ইত্যাদি তৈরি করে ?
i) ইস্পাত b) ইলেক্ট্রনিক c) অ্যালুমিনিয়াম বিগলন d) তথ্যপ্রযুক্তি

2. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

i) শ্রমশিল্প কী ?
ii) শিল্প স্থাপনের জন্য তিনটি প্রাকৃতিক পরিবেশের নাম লেখো।
iii) শিল্প স্থাপনের জন্য তিনটি মনুষ্য প্রভাবকের নাম লেখো।
iv) মূল শিল্প কী ? একটি উদাহরণ দাও।
v) সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল সমূহের নাম লেখো।

3. নীচের প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 120 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

i) সম্মিলিত ইস্পাত কারখানা কীভাবে ছোটো ইস্পাত কারখানা থেকে পৃথক ? এই ধরনের শিল্প কোন্ সমস্যার সম্মুখীন হয় ? বর্তমানে কোন্ সংস্কারের ফলে এই শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে ?
ii) কীভাবে শিল্প কারখানা পরিবেশকে দূষিত করে ?
iii) শিল্পোদ্যোগের কারণে পরিবেশের অবক্ষয় কমানোর জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করো।

কাজ

শিল্প সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সঠিক উত্তর ইংরেজি শব্দে লেখো এবং প্রতিটি ইংরেজি শব্দের প্রথম অক্ষরসহ বন্ধনীতে অক্ষরের সংখ্যা দেওয়া আছে।

i) যন্ত্র চালাতে ব্যবহৃত হয় (5) P ....
ii) কারখানায় যাঁরা কাজ করে (6) W ....
iii) যেখানে পণ্য বিক্রয় হয় (6) M ....
iv) যে ব্যক্তি পণ্য বিক্রয় করে (8) R ....
v) দ্রব্য উৎপাদন (7) P ....
vi) তৈরি বা উৎপাদন করা (11) M ....
vii) ভূমি, জল এবং বায়ুর অবনমন (9) P ....

প্রকল্প

তোমাদের এলাকার একটি কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং একটি খনিজ ভিত্তিক শিল্প নির্বাচন করো।

i) তারা কী কী কাঁচামাল ব্যবহার করে ?
ii) পরিবহণ মূল্যের সাথে যুক্ত এমন শিল্প প্রক্রিয়াকরণের অন্যান্য জোগানগুলো কী কী ?
iii) এই কারখানাগুলো কি পরিবেশের নিয়ম নীতিগুলো অনুসরণ করে ?

কাজ

গোপন উত্তর খুঁজে পেতে নীচের ছকটি অনুভূমিকভাবে (Horizontally) এবং উল্লম্বভাবে (Vertically) অনুসন্ধান করো এবং ধাঁধাটি সমাধান করো।

নোট : ধাঁধার উত্তর ইংরেজি শব্দে দেওয়া আছে।

G	G	G	P	V	A	R	A	N	A	S	I
U	O	J	I	P	G	X	K	M	Q	W	V
K	S	U	G	A	R	C	A	N	E	E	N
O	T	T	O	N	O	Z	V	O	P	T	R
A	U	E	L	U	B	H	I	L	A	I	U
T	K	O	C	R	A	Q	N	T	R	L	N
E	I	R	O	N	S	T	E	E	L	S	J
E	N	A	N	O	E	P	I	T	L	R	Y
G	A	N	U	J	D	R	A	G	D	T	A
N	T	A	R	P	O	A	P	U	E	P	Y
A	S	N	A	E	N	J	D	I	Y	S	K
S	M	H	V	L	I	A	J	H	S	K	G

1) কৃষি থেকে প্রাপ্ত কাঁচামাল দিয়ে গড়ে ওঠা বস্ত্র, চিনি ও বনস্পতি তেল এবং বাগিচা শিল্পদের বলা হয় ....।
2) চিনি শিল্পের মূল কাঁচামাল।
3) এই তন্তুটি "স্বর্ণ তন্তু" নামে পরিচিত।
4) লৌহ আকরিক, কোক কয়লা ও চুনাপাথর এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল।
5) ছত্তিশগড়ে অবস্থিত একটি সরকারি ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র।
6) উত্তরপ্রদেশের এই স্থানে রেলের ডিজেল ইঞ্জিন নির্মিত হয়।

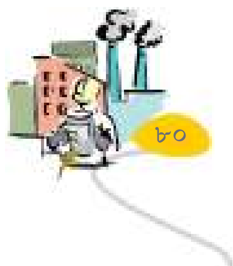

জাতীয় অর্থনীতির জীবনরেখাসমূহ

LIFELINES OF NATIONAL ECONOMY

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রকার পদার্থ এবং পরিসেবা ব্যবহার করি। এর মধ্যে কয়েকটি আমাদের চারপাশের পরিবেশে পাওয়া যায়, তবে অন্যান্য প্রয়োজনীয়তাগুলো অন্য স্থান থেকে এনে পূরণ করা হয়। পণ্য এবং পরিসেবা সরবরাহকৃত স্থান থেকে চাহিদার স্থানে নিজে থেকে যেতে পারে না। এসকল পণ্য এবং পরিসেবা সরবরাহকৃত স্থান থেকে তাদের চাহিদার স্থানে পৌঁছে দেবার জন্য পরিবহণের প্রয়োজন। কতিপয় ব্যক্তি এইসব পরিবহণকে সহজসাধ্য করার কাজে যুক্ত থাকে। যারা পণ্য উৎপাদন করে পরিবহণের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছায় তাদের ব্যবসায়ী বলা হয়। এভাবে একটি দেশের অগ্রগতির ধারা পণ্য এবং সেবার উৎপাদনের সাথে সাথে এগুলোর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহণের ওপর নির্ভর করে। এজন্য দ্রুত উন্নতির পূর্বশর্ত হল পরিবহণের কার্যকর মাধ্যম।

এসমস্ত পণ্য এবং সেবার আদানপ্রদান আমাদের পৃথিবীর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমন্ডল, অর্থাৎ স্থল, জল এবং বায়ুমন্ডলে করা যেতে পারে। এগুলোর ওপর ভিত্তি করে পরিবহণকেও স্থল, জল এবং বায়ু পরিবহণে শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে।

বাণিজ্য এবং পরিবহণ প্রভাবিত অঞ্চল দিগদিগন্তে প্রসারিত হয়েছে। কার্যকর এবং তীব্র গতিসম্পন্ন পরিবহণের কারণে আজ বিশ্ব এক বিশাল গ্রামে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সমভাবে বিকশিত হওয়া যোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে পরিবহণ এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে। এজন্যই পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বাণিজ্য একে অপরের পরিপূরক।

বর্তমানকালে, ভারত নিজের বিশাল আয়তন, বৈচিত্র্য, ভাষাগত এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের অন্যান্য অংশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। রেলপথ, বিমানপথ, জলপথ, সংবাদপত্র, রেডিয়ো, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র এবং ইন্টারনেট এর আর্থসামাজিক বিকাশে বিভিন্নভাবে সহায়তা করছে। স্থানীয় স্তর থেকে আন্তর্জাতিক স্তরের বাণিজ্য ভারতের অর্থনীতিকে জীবনীশক্তি প্রদান করেছে। এটি আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে এবং আরামদায়ক জীবনের জন্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করেছে।

এই অধ্যায়ে, তোমরা দেখতে পাবে যে, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিক মাধ্যম কীভাবে দেশ এবং তার আধুনিক অর্থব্যবস্থাকে জীবনরেখা রূপে সঞ্চালিত করছে। অতএব এটি

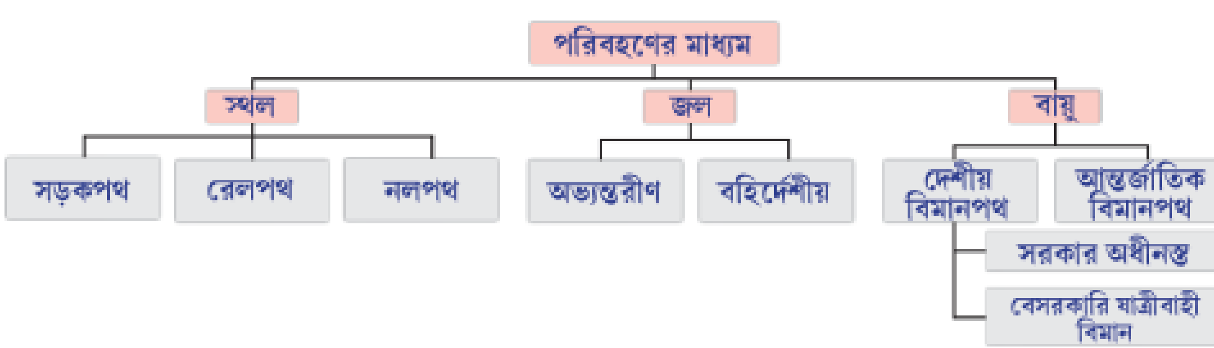

চিত্র 7.1

সুদীর্ঘ সময় ধরে ব্যবসাবাণিজ্য এবং পরিবহণ একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুস্পষ্ট যে, বর্তমানকালে স্থানীয়, জাতীয় এবং বিশ্ব স্তরে বাণিজ্যের এক পূর্বশর্ত হল নিবিড় ও কার্যকরী পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা।

পরিবহণ (Transport)

সড়কপথ (Roadways)

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম সড়কপথের নেটওয়ার্কের (Road Network) একটি অন্যতম দেশ, যা মোট প্রায় 54.7 লক্ষ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত (2014-15)। ভারতে সড়কপথ, রেলপথ অপেক্ষা পূর্বে আরম্ভ হয়েছে। নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের দিক থেকে ভারতে সড়কপথ, রেলপথ অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক। রেলপথ অপেক্ষা সড়ক পরিবহণ নিম্নলিখিত কারণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যথা- a) রেলপথ থেকে সড়কপথের নির্মাণমূল্য অপেক্ষাকৃত কম। b) অপেক্ষাকৃত ব্যবচ্ছিন্ন এবং তরঙ্গায়িত ভূমিরূপগুলোতেও সড়কপথ তৈরি করা যেতে পারে। c) অধিক নতিযুক্ত ঢালে এবং হিমালয়ের মতো পার্বত্য অঞ্চলেও সড়ক তৈরি করা যেতে পারে। d) স্বল্প দূরত্ব, অল্প সংখ্যক ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণ পণ্যের সড়কপথে পরিবহণও লাভজনক। e) এটি ঘরে ঘরে পরিসেবা প্রদান করে, তাই দ্রব্যাদি বোঝাই এবং খালাসের খরচও অপেক্ষাকৃত কম হয়। f) সড়ক পরিবহণ, অন্যান্য সকল পরিবহণ মাধ্যমের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, কারণ রেলস্টেশন, বায়ু এবং সমুদ্র বন্দরের মধ্যেকার যোগসূত্র হিসাবেও এটি কাজ করে।

ভারতে, রাস্তাগুলোর ধারণক্ষমতা বা সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে সড়ক পরিবহণকে ছ'টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। জাতীয় রাজপথ মানচিত্রের দিকে লক্ষ করো এবং এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা খুঁজে বের করো।

- ***সুবর্ণ চতুর্ভুজ উত্তম রাজপথ (Golden Quadrilateral Super Highways) :*** ভারত সরকার দিল্লি-কলকাতা-চেন্নাই-মুম্বাই এবং দিল্লিকে সংযুক্ত করার জন্য ছয় লেনযুক্ত উত্তম রাজপথের একটি প্রধান সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প প্রারম্ভ করেছে। শ্রীনগর (জম্মু ও কাশ্মীর) ও কন্যাকুমারীকে (তামিলনাড়ু) সংযোগকারী উত্তর-দক্ষিণ করিডর এবং শিলচর (আসাম) ওপোরবন্দরের (গুজরাট) সংযোগকারী পূর্ব-পশ্চিম করিডর এই প্রকল্পের অংশ। এসব উত্তম রাজপথের প্রধান উদ্দেশ্য হল ভারতের মহানগরীগুলোর মধ্যেকার সময় এবং দূরত্ব হ্রাস করা। এই রাজপথ পরিকল্পনাগুলো ভারতের জাতীয় রাজপথ কর্তৃপক্ষ (National Highway Authority of India) সংক্ষেপে NHAI দ্বারা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- ***জাতীয় রাজপথ (National Highways) :*** জাতীয় রাজপথসমূহ দেশের সুদূর স্থানগুলোকে যুক্ত করে। এগুলো হল প্রাথমিক সড়ক ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তর (Central Public Works Department) সংক্ষেপে CPWD দ্বারা নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। বহু সংখ্যক প্রধান জাতীয় রাজপথসমূহ উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম দিকে প্রসারিত। ঐতিহাসিক শেরশাহ সুরি মার্গ জাতীয় রাজপথ সংখ্যা-1 নামে পরিচিত, যা দিল্লি এবং অমৃতসরের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত।

চিত্র 7.2 : আহমেদাবাদ-ভাদোদরা এক্সপ্রেসওয়ে

কাজ

জাতীয় রাজপথ 2 এবং 3 দ্বারা সংযুক্ত স্থানগুলো খুঁজে বের করো।

তোমরা জান কি ?

তোমরা কি জান যে, বারাণসী এবং কন্যাকুমারী ভায়া জব্বলপুর, নাগপুর, হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালুরু ও মাদুরাই জাতীয় রাজপথ-7 হল দীর্ঘতম রাজপথ যা 2369 কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। দিল্লি ও মুম্বাই জাতীয় রাজপথ-8 দ্বারা যুক্ত এবং জাতীয় রাজপথ-15 রাজস্থানের অধিকাংশ এলাকায় বিস্তৃত।

- ***রাজ্য রাজপথ (State Highways) :*** কোনো রাজ্যের রাজধানীর সঙ্গে বিভিন্ন জেলার সদর দপ্তরকে সংযুক্তকারী রাস্তাগুলো রাজ্য রাজপথ নামে পরিচিত। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই রাস্তাগুলো রাজ্য পূর্ত দপ্তর (Public Works Department, সংক্ষেপে PWD) দ্বারা নির্মিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

- ***জেলা রাজপথ (District Roads) :*** এই রাস্তাগুলো জেলার বিভিন্ন স্থানের সাথে জেলার সদর দপ্তরকে যুক্ত করে। এগুলো জেলা পরিষদ দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

- ***অন্যান্য সড়কপথ (Other Roads) :*** গ্রাম্য রাস্তাসমূহ যা গ্রামীণ এলাকা এবং গ্রামের সঙ্গে শহরকে সংযুক্ত করে, এগুলো এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। "প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা" দ্বারা এই রাস্তাগুলোর উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের অধীন

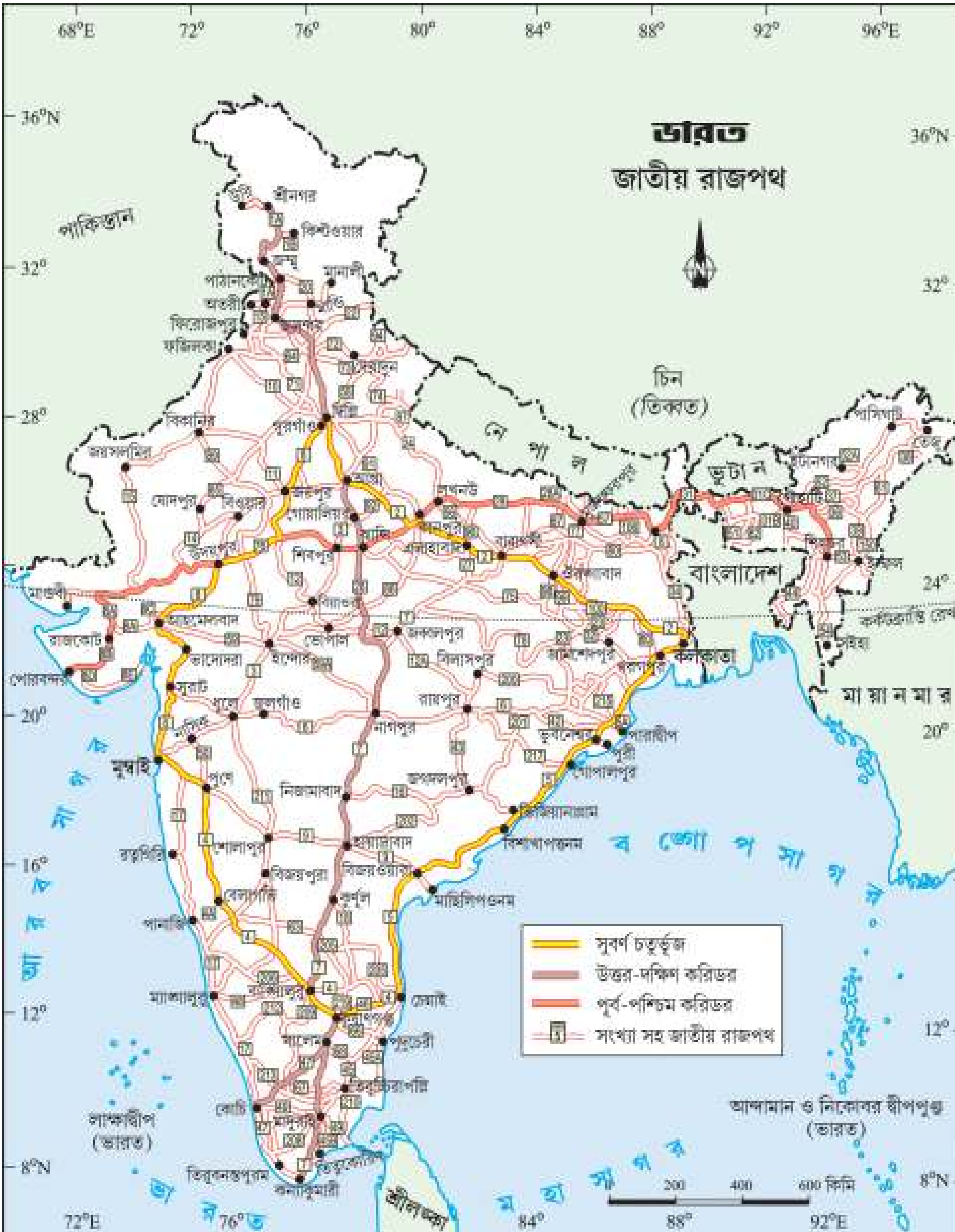
ভারত
জাতীয় রাজপথ
সুবর্ণ চতুর্ভুজ
উত্তর-দক্ষিণ করিডর
পূর্ব-পশ্চিম করিডর
সংখ্যা সহ জাতীয় রাজপথ
পাকিস্তান
চিন
(তিব্বত)
নে পা ল
ভুটা ন
বাংলাদেশ
মা য়া ন মা র
কর্কটক্রান্তি রেখা
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
(ভারত)
লাক্ষাদ্বীপ
(ভারত)
শ্রীলঙ্কা
আ র ব সা গ র
ব ঙ্গো প সা গ র
ভা র ত
ম হা সা গ র
শ্রীনগর
দিল্লি
মুম্বাই
কলকাতা
চেন্নাই
বিশাখাপত্তনম
নাগপুর
হায়দ্রাবাদ
বেঙ্গালুরু
আমেদাবাদ
ভোপাল
লখনউ
জয়পুর
পুণে
সুরাট
কন্যাকুমারী
200
400
600 কিমি

ভারত : জাতীয় রাজপথ

বিশেষ প্রতিবিধান করা হয়েছে যে, দেশের প্রত্যেকটি গ্রাম যেন দেশের একটি প্রধান সড়কের সাথে সকল ঋতুতে যাতায়াতযোগ্য রাস্তা দ্বারা যুক্ত থাকে।

- ***সীমান্ত সড়কপথ (Border Roads) :*** এগুলো ছাড়াও, ভারত সরকারের অধীনস্ত সীমান্ত সড়ক সংস্থা (Border Roads Organisation) দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় রাস্তা নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই সংস্থাটি 1960 সালে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব

চিত্র 7.3 : পাহাড়ি রাস্তা

চিত্র 7.4 : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রাস্তার যাতায়াত ব্যবস্থা (অরুণাচল প্রদেশ)

সীমান্ত এলাকায় সামরিক গুরুত্ব সম্পন্ন রাস্তাগুলোর উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সড়কগুলো দুর্গম ভূখণ্ডে অভিগম্যতা উন্নত করে ওই এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করেছে।

সড়ক নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত পদার্থ অনুযায়ীও সড়কপথকে কাঁচা এবং পাকা রাস্তায় ভাগ করা হয়। পাকা রাস্তাগুলো সিমেন্ট, কংক্রিট এমনকি পিচ দ্বারাও নির্মিত হয়, এজন্য এগুলো সব রকম আবহাওয়ার জন্যই উপযোগী। কাঁচা রাস্তাগুলো বর্ষা ঋতুতে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

- ***সড়ক ঘনত্ব (Road Density) :*** অঞ্চল প্রতি 100 বর্গ কিলোমিটার রাস্তার দৈর্ঘ্য সড়ক ঘনত্ব নামে পরিচিত। দেশে রাস্তার বণ্টন সর্বত্র সমান নয়। দেশের সব রাস্তায় ঘনত্বের তারতম্য রয়েছে, যেমন জম্মু ও কাশ্মীরে মাত্র 12.14 কিমি থেকে কেরালায় 517.77 কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত (31 মার্চ, 2011) যেখানে জাতীয় গড় ছিল 142.68 কিমি (31 মার্চ, 2011)। ভারতের সড়ক পরিবহণ বহু সমস্যার সম্মুখীন। যানবাহন এবং যাত্রীদের সংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী সড়কপথ অপর্যাপ্ত। সড়কপথের প্রায় অর্ধেকাংশই কাঁচা রাস্তা এবং তার জন্যই বর্ষাকালে এগুলোর ব্যবহার সীমিত হয়ে পড়ে। জাতীয় রাজপথের সংখ্যাও অপ্রতুল। উপরন্তু শহরের রাস্তাগুলো খুবই ঘিঞ্জি এবং সাঁকোগুলো (Culverts) পুরোনো ও সংকীর্ণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের বিভিন্ন অংশে সড়ক পথের দ্রুত বিকাশ সাধিত হচ্ছে।

- ***রেলপথ (Railways) :*** ভারতে পণ্য এবং যাত্রী পরিবহণের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে রেলপথ। রেলপথ অনেক দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত পণ্য পরিবহণের পাশাপাশি মানুষের বহুবিধ কার্যাবলি যেমন- ব্যবসা বাণিজ্য, ভ্রমন, তীর্থভ্রমন ইত্যাদিতে সাহায্য করে। ভারতীয় রেলপথ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণের মাধ্যম ছাড়াও বিগত 150 বছরের অধিক সময় ধরে এক সমন্বয়ক রূপেও কাজ করে চলেছে। ভারতীয় রেলপথ দেশের অর্থব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি ভারতের কৃষি এবং শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটায়। 2016 সালের মার্চ মাসের এক হিসাব অনুযায়ী, ভারতীয় রেল পরিবহণে 7,137টি স্টেশন, 66,687 কিমি দীর্ঘ রেলপথ, 11,122 দ্রুতগামী রেল ইঞ্জিন, 54,506 টি যাত্রীবাহী রেলগাড়ি, 6,899 টি অন্যান্য কামরাযুক্ত রেলগাড়ি এবং 2,51,256টি মালবাহী রেলগাড়ি রয়েছে।

ভারতীয় রেলপথ হল দেশের বৃহত্তম সরকারি উদ্যোগ। 1853 সালে দেশে প্রথম রেলগাড়ি মুম্বাই থেকে থানের মধ্যে চালানো হয়, যার দূরত্ব ছিল 34 কিমি।

সারণি 7.1 : ভারত : রেললাইন

ভারতীয় রেলপথ নেটওয়ার্ক 66,687 কিমি এর বেশি দীর্ঘ বিবিধ গেজ-এ বিস্তৃত পথে চলাচল করে (কলকাতা মেট্রো ব্যতীত)

গেজ (মিটার)	যাত্রাপথ (কিমি)	চলমান ট্রাক (কিমি)	মোট ট্রাক (কিমি)
ব্রডগেজ (1.676)	60,510	85,614	1,12,388
মিটার গেজ (1.000)	3,880	4,170	4,747
ন্যারো গেজ (0.762 এবং 0.610)	2,297	2,297	2,495
মোট	**66,687**	**92,081**	**1,19,630**

উৎস : *Railway Yearbook 2015–16, Ministry of Railways, Government of India. Website: www.indianrailways.gov.in*

ভারতীয় রেলপথকে এখন 16 টি অঞ্চলে পুনঃসংগঠিত করা হয়েছে।

কাজ

বর্তমানে উপস্থিত রেলওয়ে অঞ্চল এবং তাদের সদর দপ্তর খুঁজে বের করো। ভারতের মানচিত্রে রেলওয়ে অঞ্চলসমূহের সদর দপ্তর নির্দেশ করো।

দেশের রেলওয়ে নেটওয়ার্কের বণ্টন মূলত প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক বিষয়গুলো দ্বারা প্রভাবিত। উত্তরের সমভূমি, তার বিশাল ভূখণ্ড, অধিক জনঘনত্ব এবং কৃষিজ সম্পদে সমৃদ্ধির কারণে রেলপথ বিকাশে সর্বাধিক অনুকূল পরিবেশ প্রদান করে। যদিও বিপুল সংখ্যক নদীতে বিস্তৃত জলপথের উপর সেতু নির্মাণে কিছু সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। উপদ্বীপীয় অঞ্চলের পাহাড়ি ভূখণ্ডে রেলওয়ে ট্র্যাকগুলো ছোটো পাহাড়, সুড়ঙ্গপথ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে স্থাপন করা হয়েছে। উচ্চ ভূ-প্রকৃতি, বিরল জনবসতি এবং অর্থনৈতিক সুযোগের অভাবের ফলস্বরূপ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলেও রেলপথ স্থাপনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে পশ্চিম রাজস্থানের বালুকাময় সমভূমি, গুজরাটের জলাভূমি, মধ্যপ্রদেশের বনভূমি, ছত্তিশগড়, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডে রেলপথ স্থাপন করা কষ্টকর ছিল। সহ্যাদ্রির সংলগ্ন অঞ্চল শুধুমাত্র ফাঁক বা গিরিপথের মধ্য দিয়ে পার করা যেত। সাম্প্রতিককালে, পশ্চিম উপকূল বরাবর কোঙ্কন রেলপথটি ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চলে যাত্রী এবং পণ্য পরিবহণ সহজতর করেছে। এটি কিছু কিছু অঞ্চলে ট্র্যাকের ডুবে যাওয়া এবং ভূমিধসের মতো সমস্যারও সম্মুখীন হয়েছে।

বর্তমানকালে, আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে অন্য সকল প্রকার পরিবহণ মাধ্যমের মধ্যে রেলপথ অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। তথাপি, রেল পরিবহণ কিছু সমস্যার সম্মুখীন। বহু যাত্রীরা টিকিট ছাড়াই ভ্রমণ করে, চুরি এবং রেলসম্পত্তির ক্ষতিসাধন করা এখনও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়নি। মানুষ ট্রেন থামায়, অযথা ট্রেনের চেইন টেনে ধরে, যা রেল পরিবহণে ভীষণ ক্ষতি করে। আমরা কীভাবে আমাদের রেলগাড়িগুলোকে নির্ধারিত সময় অনুসারে চলতে সাহায্য করতে পারি ? এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করো।

নলপথ (Pipelines) :

নলপথ হল ভারতের পরিবহণ মানচিত্রের একটি নতুন সংযোজন। অতীতে শহর এবং কারখানাতে জল পৌঁছানোর জন্য নলপথের ব্যবহার করা হত। বর্তমানে অপরিশোধিত তেল, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, তেল থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি শোধনাগার, সার কারখানা ও বড়ো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। কঠিন পদার্থকে তরলে পরিণত করে নলপথে পরিবাহিত করানো হয়। সুদূর অন্তর্দেশীয় অঞ্চলগুলোতে শোধনাগার, যেমন- বারাউনি, মথুরা, পানিপথ এবং গ্যাসভিত্তিক কৃত্রিম সার কারখানাগুলোর নির্মাণ শুধুমাত্র এই নলপথের কারণেই সম্ভব হয়েছে। নলপথ নির্মাণের প্রারম্ভিক ব্যয় বেশি কিন্তু নলপথ পরিচালনার ব্যয় খুবই কম। এক্ষেত্রে যানান্তর জনিত ক্ষতি বা বিলম্বের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

দেশের মধ্যে প্রধানত তিন প্রকার নলপথ ব্যবস্থা রয়েছে।

- উজান আসামের তেলক্ষেত্র থেকে ভায়া গৌহাটি, বারাউনি এবং এলাহাবাদ হয়ে কানপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর একটি শাখা বারাউনি থেকে হলদিয়া ভায়া রাজবন্ধ, রাজবন্ধ থেকে মৌরীগ্রাম এবং গৌহাটি থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত।
- গুজরাটের সালায়া থেকে ভায়া ভিরামগাম, মথুরা, দিল্লি এবং সোনিপথ হয়ে পাঞ্জাবের জলন্ধর পর্যন্ত। এটার অন্য শাখা

কাজ

কাশ্মীর উপত্যকায় বানিহাল থেকে বারামুলা পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হয়েছে। ভারতের মানচিত্রে এই দুটি শহরের অবস্থান চিহ্নিত করো।

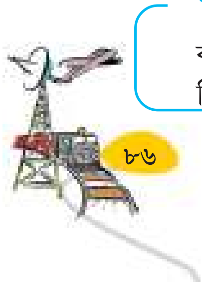

গুজরাটের ভাদোদরার নিকটে কয়ালি, চাকশু এবং অন্যান্য স্থানকে জুড়ে রেখেছে।

- গ্যাসের নলপথ গুজরাটের হাজিরাকে উত্তরপ্রদেশের জগদীশপুরের সাথে যুক্ত করেছে। এর শাখা রাজস্থানের কোটা, শাহজাহানপুর, বাব্রালা এবং উত্তরপ্রদেশের অন্যান্য স্থানে রয়েছে।

জলপথ (Water Ways)

প্রাচীনকাল থেকেই ভারত সমুদ্রপথে ভ্রমণের উপযোগী অন্যতম একটি দেশ ছিল। এর নাবিকরা কাছে এবং দূরের স্থানে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ব্যবসা ছড়িয়ে দিয়েছিল। জলপথ সবচেয়ে সস্তা একটি পরিবহণ মাধ্যম। এই পথে প্রচুর পরিমাণে ভারী পণ্য সহজে পরিবহণ করা সবচেয়ে সুবিধাজনক। এটি জ্বালানি সমৃদ্ধ এবং পরিবেশ বান্ধব একটি পরিবহণ ব্যবস্থা। ভারতের অন্তর্বর্তী অঞ্চলগুলোর মধ্যে জলপথের দৈর্ঘ্য 14500 কিমি। এর মধ্যে শুধুমাত্র 5685 কিমি যান্ত্রিক জলযান পরিবহণের উপযোগী। সরকার নিম্নলিখিত জলপথগুলোকে জাতীয় জলপথ বলে ঘোষণা করেছেন।

চিত্র 7.5 : উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে অভ্যন্তরীণ জলপথ বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হয়

- হলদিয়া এবং এলাহাবাদের মধ্যে গঙ্গা নদীর জলপথ (1620 কিমি) - N.W. No. 1
- ধুবরি এবং সাদিয়ার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর জলপথ (891 কিমি) - N.W. No.2
- কেরালার পশ্চিম উপকূলের খালপথ (কোট্টাপুরম-কোল্লাম, উদ্যোগমণ্ডল এবং চম্পাক্কারা খাল 205 কিমি)- N.W. No. 3
- কাকিনাড়া-পুদুচেরী খালপথসহ কৃষ্ণা নদীর বিশেষ নদীপথ (1078 কিমি) - N.W. No.4
- মতাই নদী, মহানদী ও ব্রাহ্মণী নদী বদ্বীপের প্রণালী এবং পূর্ব উপকূলের খালের সাথে যুক্ত ব্রাহ্মণী নদীর বিশেষ নদীপথ (588 কিমি)-N.W. No.5

জীবিকা নির্বাহের উপযোগী যাতায়াত ব্যবস্থা হিসাবে কিছু অন্যান্য অভ্যন্তরীণ জলপথ রয়েছে। এগুলো হল মাণ্ডবী, জুয়ারি, কাম্বেরজুয়া, সুন্দরবন, বরাক এবং কেরলের লেগুন।

এছাড়া উপকূলে অবস্থিত বন্দরের মাধ্যমে ভারতের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্য সংগঠিত হয়। দেশের 95% বাণিজ্য (মূল্য হিসাবে 68%) সমুদ্রপথে সম্পন্ন হয়।

প্রধান সামুদ্রিক বন্দর (Major Sea Ports):

ভারতের 7516.6 কিমি দীর্ঘ উপকূল রেখায় 12 টি প্রধান এবং 200 টি অ-প্রধান বন্দর রয়েছে। এই প্রধান বন্দরগুলোতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের 95% সম্পন্ন হয়।

স্বাধীনতা লাভের ঠিক পরে প্রথম কচ্ছের কান্ডালা বন্দরকেই বিকশিত করা হয় যা দেশ বিভাজনের পর পাকিস্তানের করাচি বন্দরের অভাব পূরণ করতে এবং মুম্বাই বন্দরের ব্যবসায়িক চাপ কমাতে সাহায্য করে। কান্ডালা জোয়ারভাটার দ্বারা প্রভাবিত একটি বন্দর। জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও গুজরাট রাজ্যের শিল্পবলয়ের অত্যধিক উৎপাদনশীল খামারের আমদানি ও রপ্তানির সুবিধার্থে এই বন্দর ব্যবহৃত হয়।

চিত্র 7.6 : মুম্বাই বন্দরে জাহাজের অভ্যন্তরে ট্রাকগাড়ি প্রবেশ করানো হচ্ছে

মুম্বাই প্রশস্থ প্রাকৃতিক ও সুরক্ষিত পোতাশ্রয়যুক্ত বৃহত্তম বন্দর। মুম্বাই বন্দরের চাপ কমানো এবং এই অঞ্চলের কেন্দ্রীয় বন্দর হিসাবে পরিসেবা প্রদানের লক্ষ্যে জওহরলাল নেহেরু বন্দরটির পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছিল। গোয়ার মার্মাগাও বন্দর হল দেশের আকরিক লোহার প্রধান রপ্তানি বন্দর। ভারতের আকরিক লৌহের 50% এই বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়।

চিত্র 7.7 : নিউ ম্যাঙ্গালোর বন্দরে তৈলবাহী জাহাজ অপরিশোধিত তেল খালাস করছে

কর্ণাটকে অবস্থিত নিউম্যাঙ্গালোর বন্দরে কুদ্রেমুখ খনি থেকে রপ্তানির জন্য আকরিক লৌহ একত্রিকরণ করা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমের একেবারে শেষ প্রান্তে লবণাক্ত হ্রদের প্রবেশ পথে স্বাভাবিক পোতাশ্রয়সহ কোচি বন্দর অবস্থিত।

পূর্ব উপকূল বরাবর এগিয়ে গেলে তোমরা দেখতে পাবে দক্ষিণ-পূর্বের সর্বশেষ প্রান্তে তামিলনাড়ুর তুতিকোরিণ বন্দরটি। এই বন্দরে রয়েছে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় এবং সমৃদ্ধ পশ্চাদভূমি। এইজন্য ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে, এমনকি শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপের মতো প্রতিবেশী দেশগুলোতে এই বন্দরের মাধ্যমে বিশাল জাহাজবাহী বিভিন্ন পণ্য সম্ভারের বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। চেন্নাই দেশের কৃত্রিম বন্দরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রধান বন্দর। বাণিজ্য এবং জাহাজবাহী পণ্য সম্ভারের পরিমাণের পরিপ্রেক্ষিতে মুম্বাইয়ের পর এই বন্দরের স্থান। বিশাখাপত্তনম গভীরতম অন্তরীপ দ্বারা সুরক্ষিত বন্দর। এই বন্দরটি প্রধানত আকরিক লোহা রপ্তানির কথা চিন্তা করে নির্মাণ করা হয়েছিল। ওড়িশার পারাদ্বীপ বন্দরটির বিশেষ করে লৌহ আকরিক রপ্তানির জন্য গড়ে উঠেছে। কলকাতা একটি অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর। এই বন্দর গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীর

চিত্র 7.8 : তুতিকোরিণ বন্দরে বিশাল মালবাহী জাহাজের পরিচালন

অববাহিকায় অবস্থিত বিশাল ও সমৃদ্ধ পশ্চাদভূমির অন্তর্ভুক্ত। জোয়ারভাটায় প্রভাবিত বন্দর হওয়ায় হুগলি নদী থেকে অনবরত বালি অপসারণের প্রয়োজন হয়। কলকাতা বন্দরের ক্রমবর্ধমান চাপ হ্রাসের জন্য সহায়ক বন্দর হিসাবে হলদিয়া বন্দর গড়ে তোলা হয়েছিল।

বিমান পথ (Air Ways)

বিমান পথে ভ্রমণ আজকাল খুবই মর্যাদাপূর্ণ, দ্রুত এবং আরামদায়ক পরিবহণ ব্যবস্থা। উঁচু পর্বত, বিস্তৃর্ণ মরুভূমি, গভীর অরণ্য এবং দীর্ঘ সামুদ্রিক ভূখণ্ডের মতো দুরূহ পথ সহজেই এই পরিবহণের মাধ্যমে অতিক্রম করা যায়।

চিত্র 7.9 : উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে কেন আকাশ পথে ভ্রমণ পছন্দ করা হয় ?

বিমান পরিসেবার অনুপস্থিতে দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোর কথা ভাবো, যেখানে বড়ো নদী, বিছিন্ন ভূ- প্রকৃতি, গভীর অরণ্য, ঘন ঘন বন্যা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত ইত্যাদি রয়েছে। বিমান পরিসেবা ভ্রমণকে অধিকতর সহজ করেছে।

1953 সালে বিমান পরিবহণকে জাতীয়করণ করা হয়। সক্রিয় কার্যকারিতার দিক থেকে ভারতীয় বিমান পথ ও তার সহযোগী বিমানপথ, বেসরকারি তালিকাভুক্ত বিমান পথ এবং তালিকাহীন পরিচালনকরা দেশের অভ্যন্তরে বিমান পরিসেবা প্রদান করে। পবনহংস হেলিকপ্টার লিমিটেড সমুদ্রের দূরবর্তী স্থানে কার্য সম্পাদনে অয়েল এন্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশনকে, উত্তর-পূর্বের রাজ্যসমূহ এবং জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের অভ্যন্তর ভাগের অগম্য এলাকা ও দুরূহ ভূখণ্ডকে হেলিকপ্টার পরিসেবা প্রদান করে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিবেশী দেশগুলোতেও ভারতীয় বিমান পরিসেবা বিস্তার লাভ করেছে।

ভারতীয় বিমান পথের সাথে সংযুক্ত দেশগুলোর নাম খুঁজে বের করো।

বিমান পরিসেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। একমাত্র উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে সাধারণ মানুষকে বিমান পরিসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

ভারত : প্রধান বন্দর এবং আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরসমূহ

যোগাযোগ ব্যবস্থা (Communication)

যখন থেকে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়, তারা যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করেছে। কিন্তু আধুনিককালে পরিবর্তনের গতি দ্রুত হয়েছে। সংবাদ প্রেরক ও গ্রাহকের কোনোরূপ শারীরিক সঞ্চালন ছাড়াই দূরদূরান্তে যোগাযোগ রক্ষা করা খুবই সহজতর হয়েছে। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও টেলিভিশন, রেডিয়ো, প্রেস, চলচ্চিত্র ইত্যাদি সহ গণমাধ্যম দেশের প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম। ভারতীয় ডাক ব্যবস্থা বিশ্বের বৃহত্তম ডাক ব্যবস্থা। ডাক বিভাগ ব্যক্তিগত চিঠিপত্রাদির মতো পার্সেলও পরিচালনা করে। কার্ড ও চিঠির খাম প্রথম শ্রেণির ডাক হিসাবে গণ্য করা হয় এবং স্থল ও বিমান পথে এইগুলো বিভিন্নস্থানে পৌঁছানো হয়। বইয়ের প্যাকেট, রেজিস্ট্রিকৃত খবরের কাগজ, সাময়িকী দ্বিতীয় শ্রেণির ডাকের অন্তর্ভুক্ত। এইগুলো সড়ক ও জলপথ পরিবহণ ব্যবহার করে ভূতল ডাকের মাধ্যমে পৌঁছানো হয়। বড়ো শহর ও নগরে দ্রুত ডাক ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য অতি সম্প্রতি ছয়টি মেইল চ্যানেল চালু করেছে। এদের রাজধানী চ্যানেল, মেট্রো চ্যানেল, গ্রিন চ্যানেল, বিজনেস চ্যানেল, বাল্ক মেইল চ্যানেল এবং পিরিওডিক্যাল চ্যানেল বলা হয়।

তোমরা জান কি ?

ডিজিটাল ভারত হল জ্ঞানভিত্তিক পরিবর্তনের জন্য ভারতকে তৈরি করার এক বিশাল কর্মসূচি (Umbrella Programme)। ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য হল II (ভারতীয় প্রতিভা) + IT (তথ্য প্রযুক্তি) = IT (আগামী ভারত) এবং প্রযুক্তিকে কেন্দ্রে রেখে পরিবর্তন আনতে হবে।

চিত্র 7.10 : 8 নং জাতীয় রাজপথে (NH-8) একটি জরুরি কল বক্স (Call Box)

টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় ভারত এশিয়ার বৃহত্তম একটি দেশ। শহর অঞ্চল ছাড়াও দুই-তৃতীয়াংশের অধিকগ্রামে STD (Subscriber Trunk Dialling) টেলিফোন পরিসেবার সুবিধা ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে। তৃণমূল স্তর থেকে উচ্চ স্তর পর্যন্ত তথ্য সম্প্রচারকে শক্তিশালী করার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার দেশের প্রত্যেকটি গ্রামে 24 ঘণ্টা STD পরিসেবার বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। সারা ভারতে একই হারে STD এর সুবিধা রয়েছে। কমিউনিকেশন প্রযুক্তির সাথে মহাকাশ প্রযুক্তিতে উন্নতির সংহতির জন্যই এটা সম্ভবপর হয়েছে।

বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচি এবং নীতি সম্পর্কে গণমাধ্যম জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং তাদের মনোরঞ্জন প্রদান করে। রেডিয়ো, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন বা সাময়িক পত্রিকা, পুস্তক এবং চলচ্চিত্র এই গণমাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের জন্য ভারতীয় আকাশবাণী (All India Radio) জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় ভাষায় বিবিধ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। ভারতের জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল দূরদর্শন বিশ্বের বৃহত্তম পার্থিব নেটওয়ার্কের মধ্যে একটি। এটি বিভিন্ন বয়স-শ্রেণির মানুষের মনোরঞ্জন, শিক্ষামূলক তথা খেলাধূলা সম্পর্কিত বহু অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে।

ভারতে অসংখ্য সংবাদপত্র এবং সাময়িক ও বার্ষিকী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সাময়িক পত্রিকাগুলো বিভিন্ন প্রকারের হয় (যেমন-মাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ইত্যাদি)। সংবাদপত্র প্রায় 100 ভাষায় এবং উপভাষায় প্রকাশিত হয়। তোমরা কি জান ভারতে সর্বাধিক হিন্দি ভাষায়, তারপর ইংরেজি এবং উর্দু ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ? ভারত বিশ্বে সর্বাধিক চলচ্চিত্র পরিচালনা করে। এটি স্বল্প সময়ব্যাপী চলচ্চিত্র, ভিডিও চলচ্চিত্র এবং স্বল্প সময়ব্যাপী ভিডিও চলচ্চিত্র পরিচালনা করে।

ভারতীয় এবং বিদেশী সকল প্রকার চলচ্চিত্রের প্রমাণপত্র কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র প্রমাণপত্র প্রদানকারী পর্যদ (Central Board of Film Certification) প্রদান করে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade)

বাণিজ্য হল রাজ্য এবং দেশের মানুষের মধ্যে পণ্যের আদানপ্রদান, বাজার হল সেইস্থান যে স্থানে পণ্যের আদানপ্রদান ঘটে। দু'টো দেশের মধ্যে বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। এটি স্থল, জল এবং বায়ু পথে সম্পন্ন হয়। যদিও স্থানীয় বাণিজ্য নগর, শহর এবং গ্রামে সম্পন্ন হয়ে থাকে। রাজ্য স্তর ভিত্তিক বাণিজ্য দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে সম্পন্ন হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অগ্রগতি কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সূচিত করে। তাই একে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি (Economic Barometer) হিসাবে ধরা হয়।

যেহেতু সম্পদ নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাই এই প্রতিযোগিতার বাজারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছাড়া কোনো দেশেরই অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। বাণিজ্যের দু'টো উপাদান হল আমদানি ও রপ্তানি। কোনো দেশের বাণিজ্যের ভারসাম্য নির্ভর করে সেই দেশের আমদানি ও রপ্তানির মধ্যেকার তারতম্যের ওপর। যখন রপ্তানি মূল্য আমদানি মূল্যের অধিক হয় তখন তাকে বাণিজ্য ভারসাম্যের অনুকূল অবস্থা বলে। সম্পূর্ণ বিপরীতে, আমদানি মূল্য যদি রপ্তানি মূল্যের অধিক হয় তখন তাকে বাণিজ্য ভারসাম্যের প্রতিকূল অবস্থা বলে।

পৃথিবীর সকল প্রধান বাণিজ্যিক বলয় এবং ভৌগোলিক অঞ্চলের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক রয়েছে। 2016-17 সালে ভারতের রপ্তানিজাত দ্রব্যের মধ্যে কৃষি এবং কৃষিজ সম্পদ শতকরা 8.64 ভাগ, মূল ধাতব পদার্থ শতকরা 6.91 ভাগ, মূল্যবান গ্রহরত্ন এবং অলংকার শতকরা 17.02 ভাগ এবং রাসায়নিক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্য শতকরা 12.06 ভাগ ছিল।

2016-17 সালে* ভারতের আমদানিকৃত দ্রব্যগুলোর মধ্যে অপরিশোধিত খনিজ তেল এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য (শতকরা 22.4 ভাগ), মূল্যবান গ্রহরত্ন এবং অলংকার (শতকরা 12.8 ভাগ), রাসায়নিক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্য (শতকরা 9.76 ভাগ), মূল ধাতব পদার্থ (শতকরা 5.95 ভাগ), বৈদ্যুতিক উপকরণ (শতকরা 10.94 ভাগ), যন্ত্রাংশ (শতকরা 8.9 ভাগ), কৃষি এবং কৃষিজাত দ্রব্য (শতকরা 5.84 ভাগ) ছিল। বিগত কয়েক দশকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। পণ্য ও সেবা বিনিময়ের ক্ষেত্রে তথ্য ও জ্ঞানের বিনিময়ের মাধ্যমে ছাপিয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারত সফটওয়্যার মহাশক্তি রূপে নিজের বিশেষ একটি জায়গা করে নিয়েছে এবং তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অত্যধিক বিদেশি মুদ্রাও অর্জন করছে।

বাণিজ্য রূপে পর্যটন (Tourism as a Trade)

বিগত তিন দশক ধরে ভারতের পর্যটন শিল্প অভূতপূর্বভাবে বিকশিত হয়েছে। ভারতে বিদেশি পর্যটকদের আগমন 2014 সালের তুলনায় 2015 সালে শতকরা 4.5 ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যার ফলে, 2015 সালে 1,35,193 কোটি বিদেশি মুদ্রা অর্জনে সহায়ক ছিল।

ভারতের ঐতিহ্যগত পর্যটনের ওপর একটি প্রকল্প তৈরি করো।

* **উৎস :** *Annual Report 2016–17, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.*

2015 সালে 8.03 মিলিয়ন বিদেশি পর্যটক ভারতে এসেছিল। 15 মিলিয়নের চেয়েও অধিক মানুষ পর্যটন শিল্পের সাথে সরাসরি যুক্ত। পর্যটন জাতীয় সংহতিকেও বৃদ্ধি করে, স্থানীয় হস্তশিল্প এবং সাংস্কৃতিক কার্যকেও সহায়তা প্রদান করে। এটি আন্তর্জাতিক স্তরে আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে উপলব্ধির বিকাশেও সাহায্য করে। বিদেশি পর্যটকরা ভারতে বিভিন্ন রকম পর্যটন যেমন ঐতিহ্যগত, পরিবেশগত, রোমাঞ্চকর, সাংস্কৃতিক, চিকিৎসা, ব্যাবসাবাণিজ্য প্রভৃতি পর্যটন করার জন্য আসেন।

দেশের সকল অংশের পর্যটন উন্নয়নের জন্য বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য বিভিন্ন প্রকার পর্যটনকে উৎসাহ প্রদান করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কাজ

ভারতের মানচিত্রে তোমার রাজ্যের/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটক স্থান এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে রেলপথ/ সড়কপথ/ বিমানপথ এর সংযোগ দেখাও।

শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো -

- তোমার রাজ্যে/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কোন্ প্রকার পর্যটন শিল্পের উন্নতি হতে পারে এবং কেন ?
- তোমার রাজ্যে/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কোন্ অঞ্চলসমূহ পর্যটন বিকাশের জন্য অধিক আকর্ষণীয় বলে তোমার মনে হয় এবং কেন ?
- একটি স্থিতিশীল উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণকারী অঞ্চলে পর্যটন কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়ক হতে পারে ?

অনুশীলনী অনুশীলনী অনুশীলনী অনুশীলনী অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :

i) নিম্নলিখিত কোন্ দু'টি প্রান্তবর্তী স্থান পূর্ব-পশ্চিম করিডর দ্বারা যুক্ত ?

a) মুম্বাই ও নাগপুর c) মুম্বাই ও কলকাতা
b) শিলচর ও পোরবন্দর d) নাগপুর ও শিলিগুড়ি

ii) নিম্নের কোন্ পরিবহণ মাধ্যমটি যানান্তর ক্ষতি এবং বিলম্বকে হ্রাস করে ?

a) রেলপথ c) নলপথ
b) সড়কপথ d) জলপথ

iii) নিম্নলিখিত রাজ্যগুলোর কোন্‌টি H.V.J. নলপথ দ্বারা যুক্ত নয় ?

a) মধ্যপ্রদেশ c) গুজরাট
b) মহারাষ্ট্র d) উত্তরপ্রদেশ

iv) নিম্নলিখিত বন্দরগুলোর মধ্যে পূর্ব উপকূলে অবস্থিত কোন্ বন্দরটি গভীরতম অন্তরীপের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ?

a) চেন্নাই c) তুতিকোরিণ
b) পারাদ্বীপ d) বিশাখাপত্তনম

v) নিম্নলিখিত পরিবহণ মাধ্যমগুলোর মধ্যে কোন্‌টি ভারতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ?

a) নলপথ c) সড়কপথ
b) রেলপথ d) বায়ুপথ

vi) নিম্নের কোন্ পরিভাষাটি দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যেকার বাণিজ্যিক সম্পর্ককে বোঝায় ?

a) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য c) বহির্বাণিজ্য
b) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য d) স্থানীয় বাণিজ্য

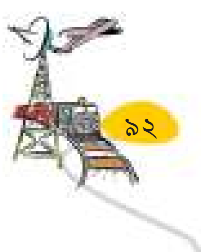

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 30 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

i) সড়কপথের যে-কোনো তিনটি সুবিধা লেখো।

ii) রেল পরিবহণ কোথায় এবং কেন সবচেয়ে সুবিধাজনক পরিবহণের মাধ্যম ?

iii) সীমান্ত সড়কপথের তাৎপর্য কী ?

iv) বাণিজ্য বলতে কী বোঝ ? আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য কী ?

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর প্রতিটি 120 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

i) একটি দেশ এবং তার অর্থনীতিতে পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমকে কেন জীবনরেখা বলা হয় ?

ii) বিগত পনেরো বছরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের প্রকৃতির ওপর একটি টীকা লেখো।

ধাঁধার সংকেত

1. উত্তর-দক্ষিণ করিডরের উত্তর সীমান্ত।
2. জাতীয় রাজপথ সংখ্যা -2 এর নাম।
3. দক্ষিণ রেলপথ অঞ্চলের প্রধান কার্যালয়।
4. 1.676 মিটার প্রস্থের রেল গেজ।
5. জাতীয় রাজপথ সংখ্যা-7 এর দক্ষিণতম সীমান্ত।
6. একটি নদী বন্দর।
7. উত্তর ভারতের ব্যস্ততম রেল জংশন।

কাজ

তোমরা উল্লম্ব, অনুভূমিক বা পাশাপাশিভাবে অনুসন্ধান করে ভারতের বিভিন্ন গন্তব্যস্থল চিহ্নিত করো।

দ্রষ্টব্য : ধাঁধার উত্তর ইংরেজি শব্দে দেওয়া

S	H	E	R	S	H	A	H	S	U	R	I	M	A	R	G
A	R	T	P	R	N	X	E	L	A	T	A	D	L	A	Y
J	M	M	X	I	P	O	R	A	Y	M	P	G	H	T	X
Y	C	H	E	N	N	N	A	I	I	K	M	C	A	I	M
O	D	C	D	A	L	M	C	S	O	T	P	O	R	C	P
A	P	T	R	G	S	K	J	M	J	L	E	A	N	E	R
R	A	E	T	A	J	P	O	R	M	W	M	A	S	X	O
I	L	S	B	R	O	A	D	G	A	U	G	E	L	O	T
A	S	N	L	C	M	E	C	U	K	Z	M	A	A	J	E
L	M	U	G	H	A	L	S	A	R	A	I	B	S	N	A
G	O	E	T	V	R	A	Y	F	T	O	R	E	A	J	M
K	Q	A	I	P	M	N	Y	R	Y	A	Y	H	L	I	N
Q	K	O	L	K	A	T	A	E	U	I	T	W	B	E	A
N	I	T	N	K	D	E	M	O	U	R	P	N	P	J	D

পরিশিষ্ট - I

তোমরা এই ওয়েব সাইটগুলো দেখতে পারো।

Bombay Natural History Society: http://www.bnhs.org/

Birding in India and South Asia: http://www.birding.in/

Website of Project Tiger: http://projecttiger.nic.in/

Nature Conservation Foundation: http://www.ncf-india.org/

Wildlife Conservation Society of India: http://www.wildlife.in/

Wildlife Trust of India: http://www.wildlifetrustofindia.org/

Kalpavriksh Environment Action Group: http://www.kalpavriksh.org/

Down to Earth Magazine: http://www.downtoearth.org.in/

Centre for Environment Education, India: http://www.ceeindia.org/cee/index.html

World Steel Association : http://www.worldsteel.org

India Tourism Statistics, 2010, http://tourism.gov.in

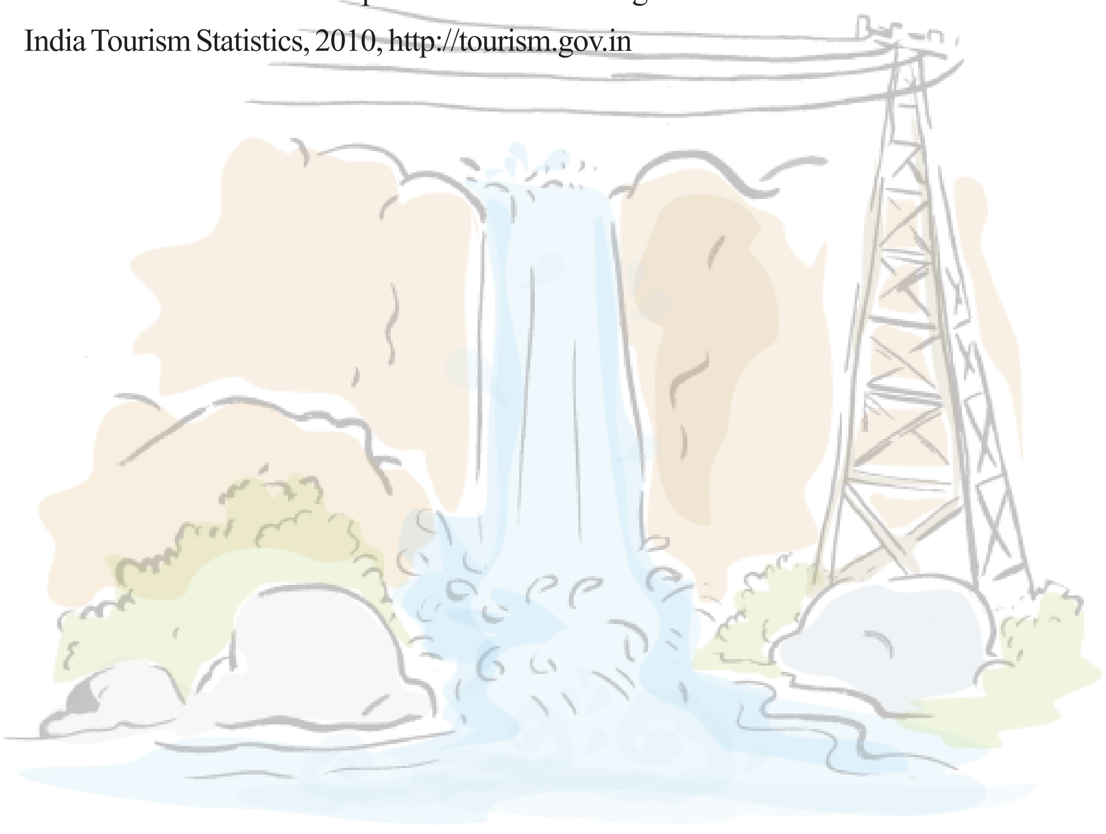

পরিশিষ্ট - II

2009-10 সালের রাজ্যভিত্তিক লৌহ আকরিক উৎপাদন শতাংশে প্রদর্শিত হল :

রাজ্য	মোট উৎপাদন (শতাংশে)
ওড়িশা	33
কর্ণাটক	11
ছত্তিশগড়	19
ঝাড়খন্ড	28
অন্যান্য	09
মোট	**100**

উৎস : *খনি মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, 2009-10 এর বার্ষিক প্রতিবেদন (Ministry of Mines, Government of India, Annual Report 2009-10)*

2009-10 সালের রাজ্যভিত্তিক ম্যাঙ্গানিজ আকরিক উৎপাদন শতাংশে প্রদর্শিত হল :

রাজ্য	মোট উৎপাদন (শতাংশে)
মধ্যপ্রদেশ	24.28
ওড়িশা	24.75
কর্ণাটক	22.00
অন্যান্য	28.07
মোট	**100**

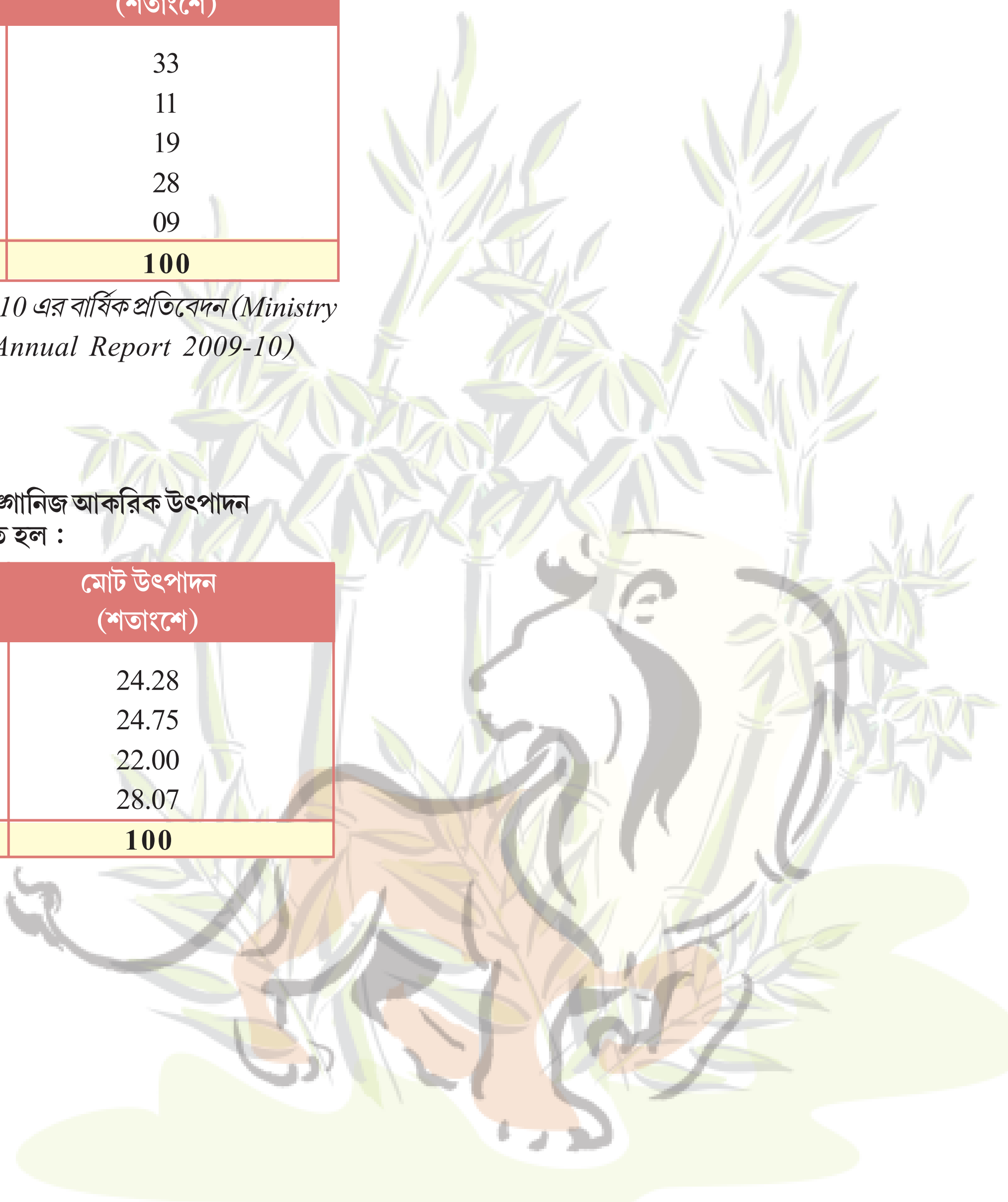

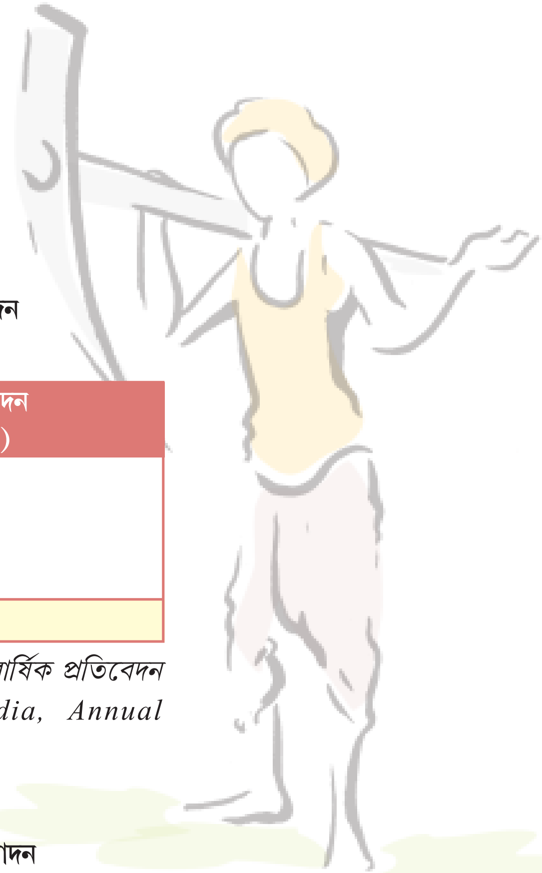

2009-10 সালের রাজ্যভিত্তিক তামা উৎপাদন শতাংশে প্রদর্শিত হল :

রাজ্য	মোট উৎপাদন (শতাংশে)
মধ্যপ্রদেশ	29
রাজস্থান	48
সিকিম	16
মোট	**100**

উৎস : *খনি মন্ত্রনালয়, ভারত সরকার, 2009-10 এর বার্ষিক প্রতিবেদন (Ministry of Mines, Government of India, Annual Report 2009-10)*

2009-10 সালের রাজ্যভিত্তিক চুনাপাথর উৎপাদন শতাংশে প্রদর্শিত হল :

রাজ্য	মোট উৎপাদন (শতাংশে)
অন্ধ্রপ্রদেশ	20
কর্ণাটক	30
অন্যান্য	50
মোট	**100**

উৎস : *খনি মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, 2009-10 এর বার্ষিক প্রতিবেদন (Ministry of Mines, Government of India, Annual Report 2009-10)*

পরিশিষ্ট - III

ইস্পাত কারখানা	সংস্থাপনের বছর	সহযোগী দেশ	অবস্থান
IISCO (ইসকো)	1870-1913 (প্রাথমিকভাবে বেসরকারি)	1972 সালে জাতীয়করণ	কুলটি ও বার্ণপুর (পশ্চিমবঙ্গ)
TISCO (টিসকো)	1907 (বেসরকারি মালিকানা)	জামশেদজি টাটা (Jamshedji Tata)	জামশেদপুর (ঝাড়খণ্ড)
VISL (ভি আই এস এল)	1923 (বেসরকারি, যেমন- MISCO)	পরবর্তী সময়ে জাতীয়করণ	ভদ্রাবতী (কর্ণাটক)
Bhilai (ভিলাই)	1959 (সরকারি ক্ষেত্র)	সোভিয়েত ইউনিয়ন (Soviet Union)	ভিলাই (এম পি)
Bokaro (বোকারো)	1972 (সরকারি ক্ষেত্র)	সোভিয়েত ইউনিয়ন (Soviet Union)	বোকারো (ঝাড়খণ্ড)
Durgapur (দুর্গাপুর)	1959 (সরকারি ক্ষেত্র)	ইংল্যান্ড (U.K.)	দুর্গাপুর (পশ্চিমবঙ্গ)
Rourkela (রাউরকেলা)	(সরকারি ক্ষেত্র)	জার্মান (Germany)	রাউরকেলা (ওড়িশা)
Vishakhapatnam (বিশাখাপত্তনম)	--- (সরকারি ক্ষেত্র)	——	বিশাখাপত্তনম (অন্ধ্রপ্রদেশ)
Salem (সালেম)	--- (সরকারি ক্ষেত্র)	——	সালেম (তামিলনাড়ু)
Vijay Nagar (বিজয়নগর)	--- (সরকারি ক্ষেত্র)	——	কর্ণাটক

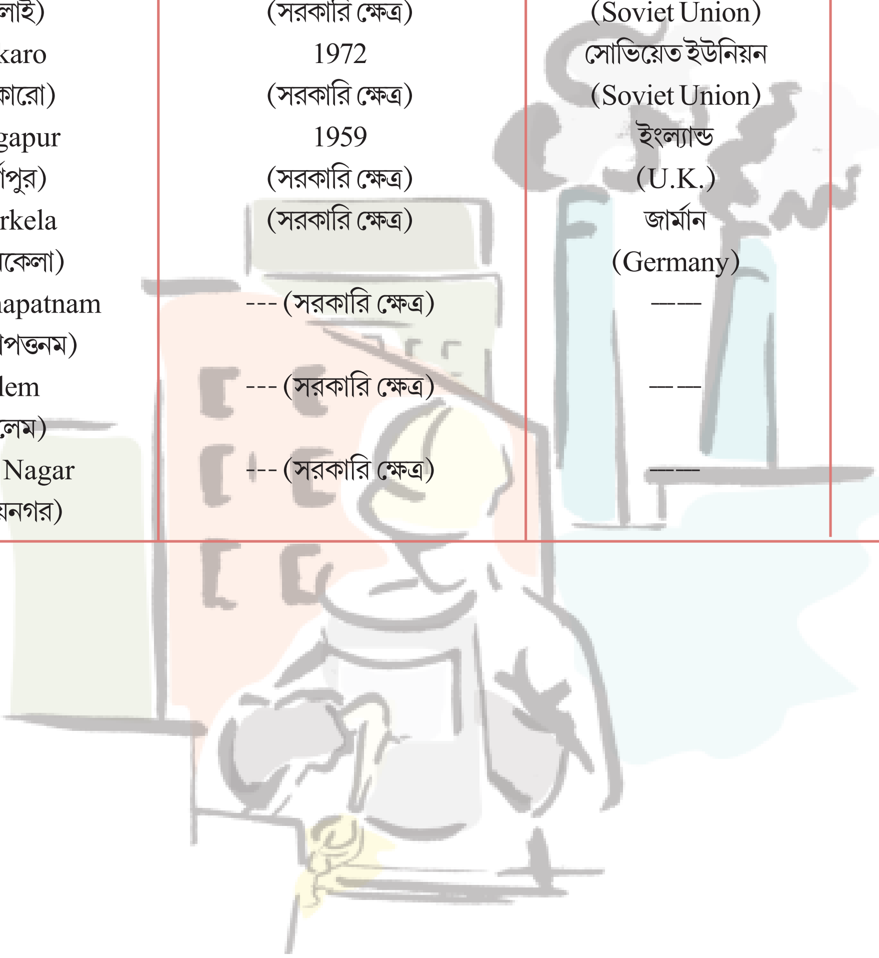

শব্দকোশ

উর্ধ্বভঙ্গ (Anticline)	:- পাললিক শিলা স্তরের একটি ভাঁজ যা খিলানের মতো দেখায়।
মোট দেশীয় উৎপাদন (Gross Domestic Product)	:- এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাধারণ অর্থব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদিত পণ্য ও পরিসেবার আর্থিক মানের পরিমাপ। সাধারণত এটি একটি বছরের জন্য ধরা হয়।
ভূতত্ত্ববিদ (Geologist)	:- পৃথিবীর গঠন, কাঠামো এবং ইতিহাস অধ্যয়নরত একজন বিজ্ঞানী।
ভূতাপীয় নতিমাত্রা (Geothermal Gradient)	:- ভূত্বকের (Crust) গভীরতার সাথে সাথে তাপমাত্রার ক্রমাগত বৃদ্ধি। ভূত্বকের সর্বোচ্চ স্তরে এই তাপমাত্রার গড় বৃদ্ধির হার প্রতি কিলোমিটারে $30^{o}c$।
হিউমাস (Humus)	:- মৃত এবং ক্ষয়প্রাপ্ত জৈবপদার্থ মৃত্তিকার উপরিস্তরে উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
আগ্নেয় শিলা (Igneous Rocks)	:- গলিত ম্যাগমা জমাট হয়ে যেসব শিলা তৈরি হয়।
ম্যাঙ্গানিজ নোডিউলস (Manganese Nodules)	:- মহাসাগরীয় তলদেশে ছড়িয়ে পড়া এক ধরনের পললভূমি যার মধ্যে প্রধানত ম্যাঙ্গানিজ ও লোহা এবং সাধারণত কম পরিমাণে তামা, নিকেল ও কোবাল্ট থাকে।
রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic Rocks)	:- যে সকল শিলা মূলত আগ্নেয় বা পাললিক শিলা থেকে উৎপন্ন অথচ তাদের আকৃতির ও বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটেছে।
তৈল ফাঁদ (Oil Trap)	:- একটি ভূতাত্ত্বিক কাঠামো যা প্রচুর পরিমাণে তেল ও গ্যাসের পুঞ্জীভবনে সহায়তা করে।
শিলা (Rock)	:- খনিজের একটি দৃঢ় মিশ্রণ।
পাললিক শিলা (Sedimentary Rocks)	:- স্তরে স্তরে পলি সঞ্চয়ে সৃষ্ট শিলা।